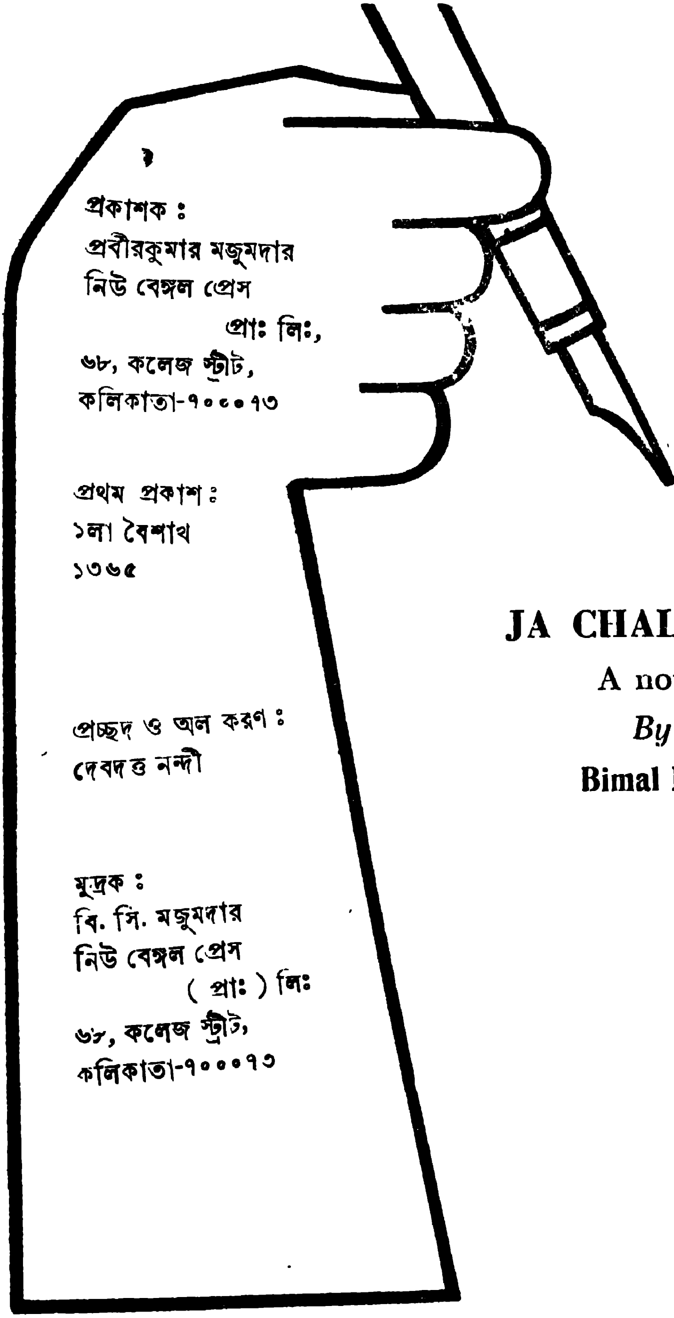
যা চলছে

বিমল মিত্র



নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩



প্রকাশক :
প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস
প্রাঃ লিঃ,
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ
১৩৬৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস
(প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

JA CHALCHHE

A novel

By

Bimal Mitra

॥ বিমল মিত্রের এযাবৎ লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা ॥

পতি পরম গুরু	বিষয় বিষ নয়	রাগ ভৈরব
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন	আর এক যুধিষ্ঠির	সুয়োরানী
চার চোখের খেলা	তিন নম্বর সাক্ষী	আমি বিশ্বাস করি
সাহেব বিবি গোলাম	পয়সা পরমেশ্বর	নবাবী আমল
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)	আসামী হাজির	পাঁচ কন্যার পাঁচালী
নফর সংকীর্তন	লজ্জাহরণ	নটনী
একক দশক শতক (নাটক)	স্ত্রী	স্বামী স্ত্রী সংবাদ
কড়ি দিয়ে কিনলাম	কলকাতা থেকে বলছি	বিনিদ্র
বেগম মেরী বিশ্বাস	বাহার	চলতে চলতে (ভ্রমণ)
শ্রেষ্ঠ গল্প	বিমল মিত্রের গল্প সম্ভার	কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
সখী সমাচার	গুলমোহর	জন গণ মন
সাহিত্য বিচিত্রা	রানী সাহেবা	যে যেমন
মিথুন লগ্ন	কথা চবিত মানস	চাঁদের দাম এক পয়সা
ফুল ফুটুক	কাহিনী সপ্তক	পরস্ত্রী
ও হেনরির শ্রেষ্ঠ গল্প (অনুবাদ)	এক রাজার ছয় রানী	বিবাহিতা
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)	প্রথম পুরুষ	রাজরানী হও
মন কেমন করে	মৃত্যুহীন প্রাণ	কিশোর অমনিবাস
অন্যরূপ	টক ঝাল মিষ্টি	কথা ছিল
নিশিপালন	পুতুল দিদি	
কন্যাপক্ষ	মনে রইলো	দু' চোখের বালাই
সরস্বতীয়া	হাতে রইলো তিন	যোগাযোগ শুভ
বরনারী (জাবাল)	দিনের পর দিন	মধ্যিখানে নদী
চলো কলকাতা	শনি রাজা রাহু মন্ত্রী	লাল নীল হলদে
বেনারসী	তোমরা দুজন মিলে	কে ?
কুমারী ব্রত	তিন ছয় নয়	রাজা বদল
আমি	নিবেদন ইতি—	যে অঙ্ক মেলেনি
এর নাম সংসার	রং বদলায়	টাকার মুকুট

সব ঝুট হ্যায় রাতের কলকাতা

এই কলকাতায় যা চলছে তার কি সবটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি বা জানতে পারছি?

আর তা ছাড়া সব খবর তো সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়ও না, প্রকাশিত হওয়া হয়ত সম্ভবও নয়। সব খবর যদি প্রকাশিত হতো তাহলে তো খবরের কাগজের সীমিত আয়তনে তার ভগ্নাংশও ছাপানো সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

সেদিন এই কলকাতারই একটা আদালতে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার জন্যে বেঞ্চ-ক্লার্ক, ব্যারিস্টার, এ্যাডভোকেট, প্লেনটিফ্ বা আসামী পক্ষ কেউই প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত ছিল না। বলতে গেলে এ ঘটনা যেমন অভিনব তেমনি অবাস্তব। অন্ততঃ মহামান্য আদালতের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে বলে কেউ কখনও শোনেও নি, কেউ মনে করতেও পারলে না।

যাঁরা সেদিন মহামান্য বিচারকের ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মনে আছে সেই দুর্ঘটনার কথা।

সেদিনও বিচারক অনিন্দ্য সেন অন্যদিনের মত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁর বেঞ্চ-ক্লার্ক থেকে আরম্ভ করে সবাই-ই তার আগেই এসে হাজির হয়েছিল।

বেঞ্চ-ক্লার্ক তারাপদ চ্যাটার্জি অভিজ্ঞ লোক। তার হাতে অনেক জজ্ এসেছে গেছে। তাই সেই সূত্রে অনেক জজ্‌কেই সে দেখেছে এবং বুঝেছে। বাংলা ভাষায় যাকে লোকে 'ঘুঘু' বেঞ্চ-ক্লার্ক বলে, তারাপদ চ্যাটার্জি ঠিক তাই-ই। সে নিজে অন্ততঃ বোঝে যে তার মত লোক চেনবার ক্ষমতা দুনিয়ায় আর কারো নেই।

যে যা বোঝে তা নিয়ে তর্ক করবার মত নির্বোধ লোক সে নয়। অনিন্দ্য সেনকে সে ঠিক-ঠিক বুঝেছে বলে সে মনে করেছিল। বাড়িতে গিয়ে সে তার বউকেও তাই বলতো—এবারকার জজ্‌টা খুব বোকা, জানো? একেবারে এক নম্বরের বোকা—

বউ বলতো—কি করে বুঝলে?

তারাপদ চ্যাটার্জি বলতো—জীবনে এত জজ্ চরিয়ে এলুম আর এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝবো না?

বউ বলতো—কিন্তু কিসে বুঝলে যে তোমার এ জজ্‌টাও বোকা?

তারাপদ বলতো—সে তোমাকে পরে বলবো, আরো কিছুদিন দেখি—

তারপর অনেক দিন কেটে গেল। অনেক মাস, অনেক বছর। মহামান্য আদালত

যেমন ইংরেজ আমলে থেকে বরাবর চলে আসছিল তেমনিই চলতে লাগলো। কিন্তু প্রথম দিনই তারাপদ চ্যাটার্জি যে ধারণা করে এসেছিল সেই ধারণাই তার পাকা হয়ে রইলো। সে-ব্যাপারে তার ধারণা আর কখনও বদলাবার প্রয়োজন হলো না। তারাপদ চ্যাটার্জি ভালো করেই জেনে গেল যে এই নতুন জজ্ একজন নির্বোধ লোক ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু তার সব ধারণা হঠাৎ একদিন আমূল বদলে গেল।

শুধু যে বেঞ্চ্-ক্লার্ক তারাপদ চ্যাটার্জির ধারণা বদলে গেল, তাই নয়। আদালতের এ্যাড্‌ভোকেট, ব্যারিস্টার, সলিসিটার, এ্যাটর্নি, চাপরাশি থেকে আরম্ভ করে সাধারণ একটা পিওনও জজ্ অনিন্দ্য সেনকে যেন নতুন করে চিনতে পারলে।

আশ্চর্য, আদালতের ইতিহাসে এমন জজ্‌ও জন্মায়।

বিস্ময় জিনিসটা পৃথিবী থেকে কোনও কালেই ঘুচে যাবে না। আমাদের এই পৃথিবী অনেক পুরোন জিনিস হলেও চিরকালই নতুন জিনিস বলে মনে হয়।

কিন্তু কেন তা মনে হয়?

এই প্রশ্নটাই ছোটবেলা থেকে বারবার আমাকে তাড়া করে আসছে। পুরোন পৃথিবীটা পুরোন হয় না কেন? আর পৃথিবীর সবচেয়ে শেষ সৃষ্টি হলো মানুষ, সে কেন এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

তবে কি ভাবতে হবে যে মানুষ নিজের তৈরী সংস্কারের জালে জড়িয়ে থাকে বলেই এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়?

তবু তো কখনও কখনও কোনও-না-কোনও মানুষ পৃথিবীর কোন পৃথিবীর কোনও -না-কোনও জিনিস দেখে বিস্ময়ে চমকে ওঠে! যে-মানুষ এমনি করে বিস্মিত হতে পারে সে-ই বোধহয় আসলে অনেক দেরিতে হলেও নতুন করে জন্ম নেয়। যেমন এই পৃথিবী প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে নব জন্ম নেয় বলেই কখনও সে আর পুরোন হলো না।

সেদিন মহামান্য আদালতের জজ্ অনিন্দ্য সেনের কথা শুনেই প্রত্যেকটি লোকের যেন নবজন্ম হয়েছিল। ওই বেঞ্চ্-ক্লার্ক তারাপদ চ্যাটার্জি, এ্যাড্‌ভোকেট অংশুমান ঘোষ, ফরিয়াদী পক্ষের এ্যাড্‌ভোকেট সুনীল সান্যাল সবাই যেন জজ্ অনিন্দ্য সেনের কথা শুনে নতুন করে জন্ম নিলো।

আদালতের সবাই তখন জজের রায় শোনবার জন্যে উম্মুখ হয়ে আছে।

অনিন্দ্য সেন এলেন। এসে তাঁর নিজের চেয়ারে বসলেন। বেঞ্চ্-ক্লার্ক তারাপদ চ্যাটার্জি ব্রীফটা বাড়িয়ে দিলে জজ্ সাহেবের দিকে। কিন্তু অনিন্দ্য সেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ব্রীফের কাগজ-পত্র হাত দিয়ে পাশের দিকে সরিয়ে দিলেন।

তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। অনিন্দ্য সেন যা কখনও করেন নি তাই করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন।

সবাই হতবাক।

এ কি! জজ্ অনিন্দ্য সেন যা কখনও করেন না, তাই করলেন কেন? কেন দাঁড়িয়ে উঠলেন? কিছু বলবেন নাকি তিনি?

হ্যাঁ, তিনি ধীরে গম্ভীর গলায় আদালত-ভর্তি মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন—আজ যে মামলার বিচার হওয়ার কথা ছিল, তা স্থগিত রইলো। আমি আজ অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আপনাদের কাছে কিছু বলবো—

এখানে সামান্য এক মিনিটের বিরতি।

সমস্ত আদালত-কক্ষ স্তম্ভিত। নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

—এতদিন জজ্ অনিন্দ্য সেন মানুষের বিচার করে এসেছে, কিন্তু আজই প্রথম জজ অনিন্দ্য সেন বিচারক মানুষ অনিন্দ্য সেনের বিচার করবে। আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি আপনারা নীরবে মানুষ অনিন্দ্য সেনের কথাগুলো শুনুন। আজ আমি জজ্ অনিন্দ্য সেন নই, আজ আমি মানুষ অনিন্দ্য সেন। আমি আজ সেই মানুষ অনিন্দ্য সেনের কথাই আপনাদের শোনাবো—

তারপর একটু থেমে অনিন্দ্য সেন আবার বলতে লাগলেন—আপনাদের অনেকের মতোই আমিও একদিন আমাদের এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, আপনাদের অনেকের মতই আমিও একদিন এই দেশের হাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছি, এই দেশের জল আমি আকণ্ঠ পান করেছি আপনাদের মতই।...

আদালতের ভেতরে তখন উৎকণ্ঠ নিস্তব্ধতা, উগগ্রীব প্রতীক্ষা। জজ্ অনিন্দ্য সেন কি তাহলে আজ পাগল হয়ে গেলেন?

—না, আপনারা হয়ত ভাবছেন আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি পাগল হয়ে যাইনি। যদি আপনারা আমাকে পাগল বলে ভাবেন তাহলে ভুল করবেন। বরং বলতে পারি আমি একদিন পাগল ছিলুম, আজই প্রথম আমি মানুষ হলুম। আমি আজ মানুষ হয়েছি বলেই বিচারক অনিন্দ্য সেনকে বিচার করতে বসেছি—

তারপর একটু থেমে তিনি আবার বললেন—আজকে আপনারা আমার চেম্বারে চলুন, সেখানেই আমি আমার বিচার করবো—

বলে তিনি নিজের চেম্বারে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাঁর চেম্বারে গেলেন। তারপর তিনি সেখানে গিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

ছোটবেলায় আমার বাবা কেবল বলতেন—বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও অনিন্দ্য? কি হতে ইচ্ছে হয় তোমার?

আমি বলতাম—আমি ব্যারিস্টার হবো—

বাবা জিজ্ঞেস করতেন—কেন ব্যারিস্টার হতে চাও তুমি ?

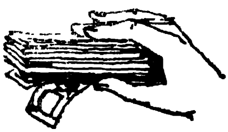
আমি উত্তর দিতাম—ব্যারিস্টার হয়ে আমি অন্যায়কে উচ্ছেদ করতে পারবো, ব্যারিস্টার হয়ে আমি আইনের সাহায্যে শোষিত মানুষদের মুক্তি দেবার জন্যে সংগ্রাম করতে পারবো—

বাবা আমার কথা শুনে খুশী হতেন কি না তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু তিনি বলতেন—ব্যারিস্টার হও আর যা-ই হও, আমি খুশী হবো যদি তুমি একদিন বড় হয়ে মানুষ হয়ে ওঠো—

আমি তখন বুঝতাম না কাকে বলে মানুষ হওয়া। গাছ যেমন গাছ, পাখি যেমন পাখি, গরু যেমন গরু, তেমনি মানুষ মানেই তো মানুষ! না, তা নয়। বাবা বলতেন—না, তা নয়। গাছের গাছ হওয়াটা শক্ত নয়, পশুর পশু হওয়াটা শক্ত নয়, কিন্তু মানুষের মানুষ হওয়াটা ভীষণ কঠিন। অনেক তপস্যায়, অনেক নিষ্ঠায়, অনেক সাধনায় তবে মানুষের মত মানুষ হওয়া সম্ভব—

জজ্ অনিন্দ্য সেন এবার একটু স্থির হলেন। একটু দম নিলেন।

তারপর আবার বলতে লাগলেন—আজ আমি আপনাদের বলবো কেন আমি মানুষ হতে পারলুম না, বলবো কেন আমি শুধু জজ্ হয়েই রইলুম, কেন আমি মানুষ হতে পারিনি। আজ আপনারা সবাই আমার সেই জজ্ হওয়ার কাহিনী শুনুন···সেই বিচারক হওয়ার ইতিবৃত্তটা শুনুন—



দিবানাথ সেন একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন।

বাড়ির সামনের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। দেখলেন···ছেলের মাস্টার মশাই টেবিলের পাশে চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে আছেন।

—কি হলো আশিফ সাহেব, খোকা ফেরেনি ?

আশিফ সাহেব অনিন্দ্যর গৃহ-শিক্ষক। বড় ভালো মানুষ। ঠিক নিয়ম করে পড়াতে আসতেন। কখনও কামাই করতেও জানতেন না তিনি। কিন্তু বিকেল বেলা দূরের মাঠে ফুটবল খেলতে যেতো অনিন্দ্য। খেলা শেষ হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতো দেরি করে। মাস্টার মশাই তখন বসে বসে ছাত্রের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

দিবানাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

—সেই বিকেল ছ'টার সময়—

দিবানাথবাবু অবাক হয়ে গেলেন—সে কি ? সেই তখন থেকে অনিন্দ্যর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন ? এখন তো ঘড়িতে সওয়া সাতটা—

আশিফ সাহেব এ-কথার কি-ই বা জবাব দেবেন ?

দিবানাথবাবু বাড়ির ভেতরের দিকে চেয়ে ডাকলেন—ও চাঁপার মা, চাঁপার মা ?

দিবানাথবাবুর ডাক শুনে চাঁপার-মা নয়, চাঁপা এসে হাজির হলো ।

বললে—আমার জন্যে কি এনেছ দাদু ?

দিবানাথবাবু সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন—আমি যে-কথা বলছি সে-কথার জবাব দিচ্ছিস নে কেন ? তোর মা কোথায় গেল ?

ছোট একফোঁটা মেয়ে, কিন্তু বড় আদুরে । তার আবদারের ঠ্যালা সামলানো মুশকিল । রোজ একটা-না-একটা আবদার তার লেগেই আছে । কোনও দিন কেক, কোনও দিন টফি, কোনও দিন কিছু-না-কিছু একটা খেলনা তার চাই-ই-চাই—

—বলো কি এনেছ আমার জন্যে ?

দিবানাথবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন চাঁপার অত্যাচারে । বললেন—রোজ-রোজ আবার কি আনবো রে তোর জন্যে ? আজকে কিচ্ছু আনিনি—

চাঁপা বললে—তাহলে কিন্তু আমি খুব কাঁদবো—

—কাঁদ । তুই কাঁদলে আমার কি ? তোর মা-ই তোর পিঠে কিল মারবে তখন গুম্ গুম্ করে ।

চাঁপা বললে—তাহলে তুমি যে দাদার জন্যে কত কি কিনে আনো ? তার বেলায় ? অনিন্দ্যদাই বুঝি তোমার সব, আর আমি বুঝি কেউ নই ?

আর তারপরেই শুরু হতো দিবানাথবাবুর হেনস্থা । তখন কাঁদতে বসবে চাঁপা । একেবারে বাড়ি কাঁপিয়ে কান্না । সেই কান্না শুনে দৌড়ে আসবে চাঁপার মা ।

বলবে—কি হলো রে ? কি হলো ? অত গলা ফাটিয়ে কাঁদছিস কেন না ? হলোটা কি ?

আর শুধু কি চাঁপার মা ? দিবানাথবাবুর স্ত্রীও তখন এসে হাজির হবে ।

সব শুনে বলবে—আদর দিয়ে-দিয়েই তুমি দেখছি ওর মাথাটা খাবে ।

তখন চাঁপা বলবে—দেখো না দিদিমা, আমি বুঝি বাড়ির কেউ না ? আমার বুঝি ক্ষিধে পায় না ? আমার বেলায় দাদু কেন কিছু কিনে আনবে না—

তা বটে । সে জানে সে এ-বাড়ির মেয়ে । এ-বাড়িতে থাকার জন্মগত অধিকার আছে তার । দিবানাথবাবু অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে যদি অনিন্দ্যর জন্যে কোনও দিন কিছু কিনে আনেন তাহলে চাঁপার জন্যেও কিছু

কিনে আনতে হবে। যদি কিছু কিনে না আনেন তাহলে পাড়া মাত্‌ করে কাঁদতে বসবে চাঁপা।

সেদিনও দিবানাথবাবুর ডাকে চাঁপার মা এলো না, এলো চাঁপা নিজে।

বাইরের ঘরে তখন অনিন্দ্যর মাস্টারমশাই চুপ করে ছাত্রের বাড়ি ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

চাঁপাকে থামিয়ে দিবানাথবাবু কোনও রকমে ভেতরে চলে গেলেন।

অনিন্দ্য সেনের মা বরাবর কম কথার মানুষ। বেশী কাজ কোনও দিনই তাঁর ধাতে সয় না। বিয়ে হওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য কোনও দিনই ভালো গেল না। তখন অনিন্দ্যর ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন। তখন থেকেই তিনি বলতেন—বউমা, তুমি শুয়ে পড়ো গে যাও, তোমার শরীর খারাপ। খারাপ শরীর নিয়ে কাজ করলে শেষকালে তুমি অসুখে পড়বে—

যখন অনিন্দ্য জন্মালো তখন আর শাশুড়ী নেই। তবে কাজের লোক তখন অনেক ছিল বাড়িতে। তেমন কোনও কষ্ট হয়নি কারো। বাড়ির প্রথম সন্তান অনিন্দ্য। প্রথম সন্তান যেমন, তেমনি আবার শেষ সন্তানও বটে।

দিবানাথ ছেলেকে নিয়ে পাড়ার পার্কে বেড়াতে যেতেন।

ছেলের তখন অদম্য কৌতূহল। যা সে দেখবে তাই নিয়েই সে প্রশ্ন করবে।

—ওটা কি বাবা? ওই যে একবার লাল আলো জ্বলছে আর একবার সবুজ আলো। ও-রকম হচ্ছে কেন?

দিবানাথবাবু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন সব।

ছেলের তবু কৌতূহল মেটে না। একটা প্রশ্নের জবাব তো সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা নতুন প্রশ্ন। পাখি কি করে আকাশে ওড়ে আর মানুষই বা আকাশে উড়তে পারে না কেন, তার জবাব দিতে হবে বাবাকে।

দিবানাথবাবু শেষকালে বিরক্ত হয়ে উঠতেন।

বলতেন—তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়িয়ে তো আমার দেখছি জ্বালাতন হওয়ার অবস্থা—

শেষকালে বলতেন—তুমি যখন বড় হয়ে উঠবে তখন নিজেই সব জানতে পারবে—

তখন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পালা।

বাবা বললেন—দিশী ইস্কুলে তোমাকে ভর্তি করাবো না, তোমাকে পড়াবো ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে। ইংরিজী না পড়লে জীবনে কিচ্ছু হতে পারবে না—

শেষ পর্যন্ত তাই-ই করা হলো। অনিন্দ্য সেন ভর্তি হলো 'ব্লু এ্যাঞ্জেলে'—

দিবানাথ নিজে স্কুলে গিয়ে রেক্টরের সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

জিজ্ঞেস করতেন—কেমন লেখা-পড়া করছে অনিন্দ্য? আমার ছেলে?

রেক্টর বলতেন—সে-রিপোর্ট তো পাঠাই আপনার কাছে—খুব ভালো ছেলে অনিন্দ্য। দেখবেন একদিন আপনার ছেলে জীবনে খুব সাইন্ করবে—

স্কুলে যা পড়বার তা তো টীচাররা পড়াচ্ছেই। কিন্তু বাড়িতে কে গাইড্ করাবে? একজন তো হোম-টিউটার চাই—

কোথায় সে-রকম হোম-টিউটার পাওয়া যাবে?

শেষ পর্যন্ত তাও পাওয়া গেল। মোহম্মদ আশিফ। মোহম্মদ আশিফ গরিবের ছেলে, কিন্তু লেখা-পড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট্। হায়ার-সেকেণ্ডারীতে স্কলারশিপ পেয়েছেন। থ্রী-ইয়ার ডিগ্রী কোর্সে তখন পড়ছেন। অথচ সংসারে অনেক গলগ্রহ। তাই ছেলে মেয়ে পড়িয়ে সেটা পূরণ করতে হয়—

প্রথম দিনেই তিনি একটা বই পড়তে দিলেন ছাত্রকে—

অনিন্দ্য দেখলে বইটার নাম লেখা আছে—MAN—

মানুষ!

সেই অনিন্দ্য সেনের জীবনের প্রথম মাস্টারমশাই মোহম্মদ আশিফ সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া প্রথম পুরস্কার একটা বই। নাম 'ম্যান'। তার মানে মানুষ। পৃথিবীতে যারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে জন্মেছে তাদের কীর্তি-কাহিনীর কথা তাতে লেখা আছে।

অনিন্দ্য সেন সেই ছোটবেলাতেই বুঝে গিয়েছিল যে দুটো হাত, দুটো চোখ, দুটো কান, বা দুটো পা থাকলেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ হওয়া অনেক শক্ত। একটা গাছের গাছ হয়ে ওঠা সহজ, একটা পশুর পশু হয়ে ওঠাও সহজ। কিন্তু মানুষ? মানুষকে যথার্থ একজন মানুষ হতে গেলে অনেক তপস্যা, অনেক নিষ্ঠা, অনেক সাধনা করতে হয়। তাই মানুষ হওয়ার সাধনা করাই হচ্ছে পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্ত সাধনা।

তা মানুষ হতে গেলে তোমাকে কি-কি কাজ করতে হবে?

মাস্টারমশাই আশিফ সাহেব বলতেন—এই বইতেই সে-কথা লেখা আছে। দেখবে সক্রেটিসের কথা লেখা আছে, এ্যারিস্টটলের কথা লেখা আছে, প্লেটোর কথা লেখা আছে। সক্রেটিসকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল, তা জানো তো?

—না। কেন? কেন বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল?

আশিফ সাহেব বুঝিয়ে দিতেন—বইটা পড়লেই তা বুঝতে পারবে। সক্রেটিসের একমাত্র অপরাধ হয়েছিল এই যে তিনি সকলকে বলতেন—নিজেকে চেনো। 'নো দাইসেল্ফ্—'

অনিন্দ্য বুঝতে পারতো না নিজেকে চিনলে মানুষের কি ভালোটা হবে। নিজেকে চিনতে বললে অপরাধটা কি হয় তাও তখন বুঝতো না অনিন্দ্য।

জিজ্ঞেস করতো—তাতে অন্যায়টা কি হয়েছিল সক্রেটিসের?

মোহম্মদ আশিফ বলতেন—সে-যুগে সেইটে বলাই ছিল মহা অপরাধ। এ হচ্ছে

যিশু খ্রীষ্টের জন্মের চারশো নিরেনব্বুই বছর আগেকার যুগ। তখনকার রাজা-মহারাজারা চাইতেন না যে তাদের ছাড়া প্রজারা অন্য কাউকে চিনুক, অন্য কাউকে শ্রদ্ধা করুক। তাই সক্রেটিসকে গ্রেফতার করে এনে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হলো।

অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করতো—তারপর? তারপর কি হলো?

—তারপর বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। তখন গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসি দেওয়ার নিয়ম চালু হয়নি। নিয়ম ছিল বিষ খাইয়ে মারার—

—তারপর? সক্রেটিস বিষ খেলেন?

মোহম্মদ আশিফ বলতেন—বিষ খাওয়ার আগে তাঁর জবানবন্দি চাওয়া হলো। বিচারকদের সামনে তিনি যদি ক্ষমা চান তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে—

—তারপর? তিনি ক্ষমা চাইলেন?

—না। তিনি ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন? তিনি যদি ক্ষমাই চাইবেন তাহলে তিনি মহাপুরুষ হলেন কেন? তিনি বিচারকদের সামনে হাজির হয়ে কি বললেন জানো? তিনি বললেন—মহামান্য হুজুর, আপনারা আমাকে ক্ষমা চাইতে বলছেন। কিন্তু ক্ষমা আমি চাইবো কেন? আমি তো জ্ঞানতঃ কোনও অপরাধ করিনি যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইবো? তিনি বললেন—তার চেয়ে আপনারা আমার মৃত্যুদণ্ড দিন। কারণ আপনারা যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড না দেন তো যে অপরাধে আপনারা আমাকে বন্দী করেছেন, আমি আবার সেই একই অপরাধ করবো।

আশিফ সাহেব থামতেন। বলতেন—সেই আদি যুগে যে মানুষ এমনি করে মৃত্যুভয় এড়াতে পেরেছিলেন তাতেই তো তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে তিনি কত বড় মাপের মানুষ—

—তারপর? তারপর কি হলো?

—তারপর তাঁকে আবার বিচারকদের সামনে এসে তাঁর জবানবন্দী দিতে বলা হলো। তাঁকে বলা হলো—এইবার তোমার শেষ বক্তব্য কি আছে বলো?

সেদিন তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা ওই বইটার মধ্যেও লেখা আছে। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জুরীদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—This one thing hold fast, gentlemen of the jury, as to death, that to a good man, wheather alive or dead, no evil can happen; even Gods are not indifferent to his well-being.

তার মানে হলো এই যে, হে জুরী মহোদয়গণ, মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ধ্রুব সত্য জেনে রাখুন যে, যে সৎ মানুষ, সে জীবিতই হোক, আর মৃতই হোক, তার কখনও কোনও ক্ষতি হয় না। সে কখনও ঈশ্বর বা খোদাতালাহ্‌র শুভ-কামনা থেকে বঞ্চিত হয় না—

অনিন্দ্য তখন ছোট। তখনও পর্যন্ত কেউই জানতো না যে সে নিজেই একদিন

কলকাতার মহামান্য আদালতের বিচারক হবে আর মানুষের ধর্ম-অধর্মের বিচার করে তার রায় দেবে।

কিন্তু কথাগুলো সেই দিনই তার বুকের ভেতরে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল : একটা কথা তার বরাবর মনে হতো এই যে সে বরাবর ন্যায়ের পথে থাকবে, বরাবর অন্যায় থেকে দূরে থাকবে। আর সে নিজের জীবনেও কখনও কোনও রকম অন্যায়কে বরদাস্ত করবে না।

পেছনের দিকে চোখ ফিরিয়ে যখনই অনিন্দ্য সেন দেখেছে তখনই তার মনে হয়েছে যে সে তার কথা রাখতে পারেনি। মনে হয়েছে যে সে কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছে। এক-কথায় সে অনেকবার অন্যায় করেছে—

কিন্তু মাঝে মাঝে অনিন্দ্য বইটার কথা ভুলে যেত। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে ফিরে আসতে দেরি হতো। সব খেলারই একটা নেশা আছে। ফুটবল খেলার মধ্যেও তেমনি একটা নেশা আছে। খেলতে খেলতে এক সময়ে খেলা শেষ করতে হতো।

কিন্তু খেলার শেষে খেলা নিয়ে আলোচনা চলতো অনেকক্ষণ ধরে। কে কখন খেলায় কোন ভুলটা করেছে, কিংবা ভুলটা না করলে কি লাভ বা লোকসান হতো তাই নিয়েই সকলে মিলে চলতো আলোচনা। সেই সব আলোচনার মধ্যে কি বাড়ির কথা কারো মনে থাকতো ? না মনে রাখা সম্ভব হতো ?

যখন বাড়ির কথা মনে পড়তো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যত বাড়ির কথা মনে পড়তো ততই বাড়ির দিকে দৌড়তে শুরু করতো অনিন্দ্য। বাড়ি থেকে খেলার মাঠ অনেক দূর। প্রায় মাইল দুয়েক হবে। মাস্টারমশাইয়ের মুখটা মনে পড়তেই ভয়ে তার মুখটা শুকিয়ে আসতো।

ভবিষ্যৎকালে যাকে একদিন আদালতের বিচারক হয়ে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে হবে তার এত ভয় কি ভালো ?

কিন্তু তখন সেই অল্প বয়েসে সে-সব ভাবনা কে ভাববে ?

বাবা ছিলেন সেকালের ধর্মভীরু লোক। সরকারি চাকরিতে নিজের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি মনে করতেন যে লোক সৎপথে থাকবে তার কোনও অনিষ্ট হবে না। তিনি আরো বলতেন যে যে-মানুষ পরের মধ্যে নিজেকে দেখে এবং নিজের মধ্যে পরকে দেখে, ঈশ্বর তার সহায় থাকেন।

ছোটবেলা থেকে বাবা এই শিক্ষাই অনিন্দ্যকে দিয়ে এসেছেন। সেই জন্যেই তো অনিন্দ্য সেন মানুষের সমাজে আজ এত বড়, আজ এত সম্মানিত ব্যক্তি।

কিন্তু অনিন্দ্য সেন কি আসলে সত্যিই এত সম্মানের যোগ্য ?

বাড়িতে আসতেই বাবা ধমকাতেন—এ কি, এতক্ষণে খেলার মাঠে আড্ডা দিচ্ছিলে নাকি ? আর ওদিকে তোমার মাস্টার সাহেব যে তোমার জন্যে এক-ঘণ্টার ওপর চুপ

করে বসে আছেন, সেদিকে খেয়াল নেই ? এত কিসের খেলা ? আমরাও তো এক সময়ে খেলতুম, কিন্তু কখনও তো আমরা লেখা-পড়ায় ফাঁকি দিইনি।

পৃথিবীর সব যুগের সব বাবারাই সব ছেলেদের বোধহয় এমনি করেই শাসন করে এসেছেন। কিন্তু তাতে ক'জন ছেলে ক'জন বাবার কথা শুনেছে ?

তখন অনিন্দ্যর লজ্জা করতো মাস্টার সাহেবের কাছে যেতে। অপরাধ করবার পরেই কেবল সকলের মনে নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে অনুশোচনা জাগে। অনিন্দ্যরও তাই মাস্টার সাহেবের সামনে যেতে খুব লজ্জা করতো।

কিন্তু চাঁপা ছাড়বার পাত্রী নয়। সে মাস্টার সাহেবের কাছে এসে বলতো—ওই দেখুন মাস্টার সাহেব, আপনার ছাত্র এতক্ষণ বাদে বাড়ি এলো—

মাস্টার সাহেব জিজ্ঞেস করতেন—কই ? কই সে ? আমার সামনে আসছে না কেন ?

চাঁপা বলতো—ভয়ে। ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না—

—ভয়ে ? কেন ? কিসের ভয় ? কাকে ভয় ?

ততক্ষণে অনিন্দ্য এসে ঘরে ঢুকলো।

চাঁপা বললে—দেখেছেন মাস্টার সাহেব, ফুটবল খেলতে গিয়ে বাড়ির কথা একেবারে ভুলে যায় অনিন্দ্যদা। আপনি একটু বকে দিন তো ওকে—

মাস্টার সাহেব বললেন—ঠিক আছে, তুমি এখন যাও, আমি তোমার অনিন্দ্যদাকে খুব বকে দেবো'খন—

চাঁপা বললে—আপনি অনিন্দ্যদাকে একবার মারুন না। আপনি মারেন না বলেই আপনার ছাত্র এমন বেয়াড়া হয়েছে।

মাস্টার সাহেব কিছু বলবার আগেই চাঁপা বললে—কই মারুন একবার, মারুন না! ওকে—মারছেন না কেন ?

অনিন্দ্য চাঁপার দিকে চেয়ে ধমক দিলে। বললে—এখান থেকে যা তুই, যা এখান থেকে—যা বলছি—

চাঁপা বললে—কেন যাবো ? নিজে পড়া-শোনা করবে না, কেবল আমার সঙ্গে ইয়ারকি !

অনিন্দ্য বললে—আমি যদি পড়া-শোনা না করি তো তোর কি ? তোকে কে ফোঁপর দালালি করতে বলেছে ?

মাস্টার সাহেব থামিয়ে দিতেন দুজনকে। বলতেন—তোমরা ঝগড়া কোরো না। যা বলবার তা আমিই বলবো—তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও—

এই সময়ে দিবানাথবাবু ঢুকলেন। তিনি তখন মুখ-হাত-পা ধুয়ে কাপড় জামা বদলে এসেছেন।

বললেন—এত ঝগড়া হচ্ছে কেন ? কিসের গোলমাল এখানে ?

মোহম্মদ আশিফ বললেন—চাঁপা এইটুকু বয়েসেই খুব হুঁশিয়ার হয়েছে—

দিবানাথবাবু বললেন—বহুদিন এ-বাড়িতে থাকতে থাকতে মেয়েটা এ-বাড়িরই লোক হয়ে গেছে কি না—

মাস্টার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—তা মেয়েটার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিন্তু খুব ভালো—

দিবানাথবাবু বললেন—ওর মা ওর জন্ম হওয়ার পর থেকেই তো আমাদের কাছে আছে—

মাস্টার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে ওর বাবাকে ও দেখেনি কোনও দিন?

দিবানাথবাবু বললেন—দেখবে কি করে? ওর যখন এক বছর বয়েস সেই সময়েই ওর বাবা মারা যায়। তারপর থেকেই ওকে সঙ্গে নিয়ে ওর মা আমাদের বাড়িতে আসে—

মাস্টার সাহেব বললেন—ওর ভাগ্যটা ভালো তাই আপনাদের মতন লোকের বাড়িতে ও আশ্রয় পেয়েছে—

দিবানাথবাবু বললেন—ছিল একটা ছেলে, এখনও এসে আমাদের নিজেদের মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে। ও মনে করে ও এ-বাড়িরই মেয়ে—

চাঁপা তখন ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

মাস্টার সাহেব বললেন—ওকে মানুষ করার দায়িত্বও এখন আপনাদের ঘাড়েই পড়লো—

দিবানাথবাবু বললেন—তা পড়লে আর কি-ই বা করা যাবে—। ওর নিজের বাপ নেই, তাই এখন আমাকেই ও নিজের বাবা বলে জানে—

তারপর নজর পড়লো অনিন্দ্যর দিকে। বললেন—আমি অনিন্দ্যর জন্যে বড্ড ভাবছি। খেলার মাঠে গিয়ে আড্ডা দিতে দিতে বাড়ির কথা ভুলে গেলে জীবনে ও কি করবে? ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুমই হয় না—

মাস্টার সাহেব অনিন্দ্যর দিকে চেয়ে বললেন—খেলা-ধুলো ভালো, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়াটাও তো চালিয়ে যেতে হবে। লেখা-পড়া না শিখলে তো জীবনে কিছুই করতে পারবে না। তোমার বাবা তো চিরকাল থাকবেন না। তখন তোমার কি হবে?

অনিন্দ্যর এ-সব কথা শোনা অভ্যেস আছে। এ-সব কথা আগেও মাস্টার সাহেবের মুখ থেকে অনেকবার শুনে এসেছে সে।

এরপর দিবানাথবাবু আর সে ঘরে দাঁড়ালেন না। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন—দেখুন, আপনি যদি বলে বলে ওকে একটু শোধরাতে পারেন। আমি বার বার বলে বলে তো হয়রান হয়ে গিয়েছি—

দিবানাথবাবুর দুঃখটা ছিল এখানেই। একটা মাত্র ছেলে সেও যদি ভালো করে লেখা-পড়া না শিখে অমানুষ হয়ে যায় তাহলে কিসের জন্যে সংসার করা? কার জন্যে এত প্রাণপাত।

কিন্তু মোহম্মদ আশিফ তার জন্যে কত না কষ্ট স্বীকার করেছেন। বাবার অর্থের অভাব ছিল না। একটা সন্তানকে উচ্চ শিক্ষা দেবার মত অমিত অর্থ ছিল তাঁর। বাবা-মা'র ইচ্ছে ছিল অনিন্দ্য কলকাতায় যত দিন ইচ্ছে উচ্চ শিক্ষা পাবে, আর তারপর প্রয়োজন হলে ইণ্ডিয়ার বাইরেও যাবে। ছেলের জন্যে সে সংস্থানও দিবানাথবাবু করে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন।

অনিন্দ্য যা কিছু আদর্শ শিখেছিল, শিখে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল তার প্রায় সবটাই নিজের বাড়ির মাস্টার সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া।

কিন্তু সেই কলেজে ভর্তি হওয়ার সময়েই প্রশ্ন উঠেছিল সে জীবনে কি করবে? অর্থাৎ কি হবে তার বৃত্তি। কোন্ পথে এগোলে তার মনোবৃত্তি প্রকৃত এবং যথাযথ-ভাবে মর্যাদামণ্ডিত হবে।

বাবার ইচ্ছে ছিল আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য ইয়োরোপ বা আমেরিকায় যাওয়া। তাহলে অনিন্দ্য সমাজে একজন বিশিষ্ট জন হিসেবে পরিগণিত হবে।

অনিন্দ্য বলতো—ওটা স্লেভারি। ওটা ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে একটা স্লেভ-মেণ্টালিটি। আমাদের দেশের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মানুষ হতে গিয়ে বিদেশের ক'টা ডিগ্রী আয়ত্ত করেছিলেন? চৈতন্যদেবই বা মানুষ হওয়ার জন্য ক'টা বিলিতি ডিগ্রী ঘরে এনেছিলেন?

দিবানাথবাবু ছেলের কথা শুনে রেগে যেতেন। বলতেন—তা তুমি কি ওঁদের মতো মহাপুরুষ মনে করো নিজেকে?

অনিন্দ্য বলতো—কথাটা মহাপুরুষের নয়, কথাটা হচ্ছে পুরুষ মানুষ হওয়া নিয়ে। আমি সেই রকম একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ হতে চাই—

—তা পুরুষ হতে গেলেও তো টাকা উপায় করা দরকার—তোমার সংসার চলবে কি করে সে কথাও তো তোমাকে ভাবতে হবে। টাকাটাও তো আগ্রাহ্য করবার জিনিস নয়—

অনিন্দ্য বলতো—যাদের অনেক টাকা আছে তারা কি সবাইই বড় মাপের মানুষ? বরং উল্টোটাই তো সত্যি—

—তার মানে?

অনিন্দ্য বলতো—আমি হিস্ট্রী পড়ে দেখেছি যাদের সবাই মহাপুরুষ বলে জানে তাদের কারো টাকা-কড়ি ছিল না। টাকা কড়িকে যাঁরাই তাচ্ছিল্য করতে পেরেছেন হিস্ট্রীতে তাঁরাই মহাপুরুষ হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন—

—তাঁরা কারা?

অনিন্দ্য বলতো—কেন, মহাবীরের কি টাকা ছিল? গৌতম বুদ্ধের কি টাকা ছিল? চৈতন্যদেবের কি টাকা ছিল? গান্ধীর কি টাকা ছিল? আরো নাম বলবো?

দিবানাথবাবু ছেলের কথা শুনে ব্যথা পেতেন মনে। গলা চড়িয়ে দিয়ে তিনি বলতেন—যাঁদের নাম তুমি করলে তাঁরা কি সাধারণ মানুষ?

অনিন্দ্য বলতো—সাধারণ মানুষই তো তাঁরা। সাধারণ মানুষ হিসেবেই তো তাঁরা মানুষের সংসারে জন্ম নিয়েছিলেন, পরে নিজের নিষ্ঠার জোরে তাঁরা অসাধারণ মানুষ হতে পেরেছিলেন—

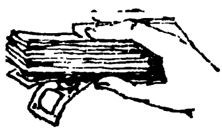
দিবানাথবাবু বলতেন—ও'দের কথা ছেড়ে দাও। ও'রা তো মানুষ নন্—

—মানুষ নন্ তো কি ও'রা?

দিবানাথবাবু বলতেন—ও'রা হচ্ছেন সুপারম্যান—সুপারম্যানদের সঙ্গে তুমি নিজেকে তুলনা করো নাকি? তুমি সাধারণ মানুষের ঘরে সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেছ, প্রশ্নটা সেই দিক থেকে বিচার করবে তো—

তা বাবা বেঁচে থাকতে এ প্রশ্নের তখন কোনও সমাধান হয়নি। হয়ত এখনও সমাধান হয়নি সে প্রশ্নের। একটা মানুষের সীমিত জীবন-কালে ক'টা মানুষের ক'টা প্রশ্নেরই বা সমাধান হয়—

একদিকে বাড়ির মাস্টার সাহেব মোহম্মদ আশিফ আর অন্যদিকে বাবা দিবানাথ সেন। মোহম্মদ আশিফ তাকে উপহার দিয়েছিলেন—'Man' নামে বইটি, আর বাবা তাকে বলতেন মানুষ হতে। এই দু'দিকের দুই টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে অনিন্দ্য সেন আজ না হতে পেরেছেন সাধারণ মানুষ, আর না হতে পেরেছেন অসাধারণ মানুষ। ও সব কিছুই না হতে পেরে শেষ পর্যন্ত হয়েছেন কেবল একজন বিচারক। আজ সেই বিচারক অনিন্দ্য সেনেরই বিচার করতে এসেছেন মানুষ অনিন্দ্য সেন—



সে আজ থেকে অনেক দিন আগেকার কথা।

তখন অনিন্দ্যর সাত কি আট বছর বয়েস। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাবা একটা বিলিতি স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন অনিন্দ্যকে। সে সকালবেলা বাসে চড়ে অন্য অনেক ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পড়তে যেতো আর ফিরতো বেলা একটা নাগাদ।

একদিন দুপুর বেলা অনিন্দ্য সেন বাড়ি ফিরে এসে দেখে তাদের বাড়িতে নতুন একজন কাজের মেয়েমানুষ এসেছে।

অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলে—ও কে মা?

মা বললে—ওই আমাদের নতুন কাজের মেয়ে—

বহুদিনের কাজের লোক বাড়িতে যে ছিল তার নাম অর্জুন। অনিন্দ্যর জন্মের আগে থেকেই নাকি সে এসেছিল এ বাড়িতে। তারপর একদিন কাজ করতে করতে কখন যে জীবন-যৌবনটাও এই বাড়ির মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছিল তা সে নিজেও যেমন খোঁজ রাখবার দরকার বোধ করেনি, তেমনি এ-বাড়ির আর কারও তার দিকে খেয়াল করবার মত অবসর হয়নি।

সেই অর্জুনই ছিল বলতে গেলে এ-বাড়ির শিরদাঁড়া। সেই মজবুত শিরদাঁড়ার জন্যেই দিবানাথবাবুর সংসার মাথা উঁচু করে অতদিন দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ জলের পাম্পের মেশিন খারাপ হয়ে গেলে গৃহস্থের যে কত অসুবিধে হয় সেটা অর্জুনের উপস্থিতিতে কেউ-ই অনুভব করতে পারতো না।

সেই অর্জুনই হঠাৎ চলে যাওয়ায় দিবানাথবাবু যত বিব্রত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি বিব্রত হয়েছিলেন সুভদ্রা। অনিন্দ্য সেনের মা।

সুভদ্রা দেবী প্রথমে খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক।

বলেছিলেন—এখন কি হবে ?

দিবনাথবাবু বলেছিলেন—কি আবার হবে ? যাদের বাড়িতে অর্জুন নেই তারা কি সবাই মরে গেছে ? যা কপালে আছে তাই-ই হবে।

সুভদ্রা দেবী বলেছিলেন—তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু সংসার তো আমাকেই করতে হবে। তুমি বাইরে বাইরে থাকবে, তোমার কি ?

তা বটে। কথাটা মিথ্যে নয়। কলকাতার মানুষের পক্ষে যে সংসার পরিচালনা করা কত কষ্টকর তা কলকাতায় যারা বাস করে তারাই জানে। একজন শক্ত-সমর্থ লোক চাই ভোরবেলায় হরিণঘাটার দুধের দোকান থেকে দুধ আনার জন্যে। আর একজন লোক চাই হপ্তায় একদিন রেশনের দোকানে গিয়ে লাইন দেবার জন্য। তারপর আছে অনেক আচমকা খুচরো কাজ। বাড়ির ইলেকট্রিক আলোর যন্ত্র যে-কোনও দিন হঠাৎ বিকল হয়ে যেতে পারে। তখন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রীকে কে ডেকে আনবে ? কে চেনে মিস্ত্রীর দোকান কোথায় ?

তা ছাড়া আরো অনেক খুচরো কাজ আছে সংসারের। সে-সব কাজের তালিকা বাড়ির সব গৃহিণীদেরই জানা আছে। বাড়ির পুরুষ কর্তারা তো টাকা উপায় করেই খালাস। যত দায় সব যেন বাড়ির গৃহিণীদেরই।

প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলো বই কি। কে বাজার করে, কে কাপড়-চোপড় কাচে, কে ঘর-দোর ঝাঁট দেয় ?

আর কাজ কি কারো একটা ?

বিশেষ করে আজকালকার এই জটিল যুগে ?

কিন্তু সেই যে কথায় আছে 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়', এ বাড়িতেও তাই হলো। দিন কেটে যেতে লাগলো কোনও রকমে। সেই ছোট বয়েসে যেদিন স্কুলের

দুটি থাকতো, অনিন্দ্যও বাবার সঙ্গে বাজারে যেতো। তখন থেকেই শুরু হলো তার বাটির সঙ্গে যোগাযোগ। বাজার যে কি জিনিস তার পরিচয় পেলো অনিন্দ্য সেন জীবনে সেই-ই প্রথম। মানুষ কে কত ওপরে উঠতে পারে তা তো MAN নামের বই-এর পাতাতেই তার পড়া ছিল। কিন্তু বাস্তবে মানুষ যে আবার কত নিচেয় নামতে পারে তা জানা হয়ে গেল বাজারে যাওয়ার পর থেকেই। সেই জন্যেই অনিন্দ্য সেন সকলকেই বলতেন—স্কুলে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সে শিক্ষাটা হলো আংশিক। কিন্তু বাজারে গেলেই মানুষের সম্পূর্ণ শিক্ষাটা হয়ে যায়।

কিন্তু আর বেশিদিন অনিন্দ্যকে বাজার যেতে হলো না। তার জায়গায় বাজারে যাওয়ার একটা লোক পাওয়া গেল হঠাৎ।

মেয়েটার নাম কালিদাসী। সেই এলো কাজের লোক হয়ে।

কালিদাসী বিধবা মানুষ। একটা মেয়ে হওয়ার পরই বিধবা হয়েছিল। তার পর থেকে তার দিন আর চলে না। তার ওপর তার মেয়ের বোঝা কেউ নিতে চায় না। তোমাকে খাওয়াতে পারি, পরাতে পারি, থাকবার জন্যে একটা না হয় মাথা গোঁজবার মতো ঘরও দিতে পারি। কিন্তু তোমার ওই বাচ্ছা মেয়ে? তার ভার নিই কি করে? তার খাওয়া-পরারও তো একটা খরচ আছে। তুমি তো আর ঝাড়া হাত পা মানুষ নও বাপু।

কিন্তু দিবানাথবাবু বললেন—তা হোক, ওকে নিয়েই কোনও রকমে দিন চালিয়ে নাও তুমি। পরে আবার একটা পুরুষ মানুষ পেলে তখন না-হয় একে ছাড়িয়ে দিলেই চলবে।

তা সেই তখন থেকেই কালিদাসী আছে। সঙ্গে চাঁপাও আছে। তার জ্ঞান-গম্যি হওয়া পর্যন্ত সে দেখে এসেছে অনিন্দ্যর বাবাকে, অনিন্দ্যর মা'কে। আর দেখে এসেছে তার নিজের মা'কে।

আসলে কে যে তার নিজের মা চাঁপা তাই-ই অনেক সময় ভুলে যায়। সে যেন এ বাড়িরই এক সন্তান। অনিন্দ্য যা খাবে চাঁপাও তাই-ই খাবে। অনিন্দ্যর নতুন জামা কেনা হলে চাঁপারও নতুন জামা হওয়া চাই। অনিন্দ্যর সব কিছুর ওপর চাঁপারও যেন একটা ভাগ আছে। সে নিজে যেন অনিন্দ্যর সহোদরা—

একবার অনিন্দ্যর জুতো কেনা হলো এক জোড়া।

চাঁপা দেখলে।

বললে—আমার জুতো হবে না? শুধু অনিন্দ্যদার জুতো কেন হবে?

এবার কান্নাকাটি চললো দু'দিন ধরে। চাঁপা তার মা'র কাছে অনেক বকুনিও খেলে।

শেষকালে দিবানাথবাবু বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, আমি তোর জুতো কিনে দেবো—শেষ পর্যন্ত চাঁপাকে জুতো কিনে দিতে হলো তবে মেয়ে শান্ত হলো।

আর শুধু কি জুতো? অনিন্দ্যর যা কিছু কেনা কাটা হবে চাঁপাকেও তাই-ই কিনে দিতে হতো। সে জুতোই হোক আর বই-ই হোক আর ছাতাই হোক। একজনের জন্যে কিনলে চলবে না, দুজনেরই এক সঙ্গে কিনে দিতে হবে।

কালিদাসী একবার খুব মেরেছিল মেয়েকে। বলেছিল—মর মর তুই, এত লোককে যমে নেয়, তোর দিকে যম একবারও তাকায় না কেন। আমার কপাল-দোষে কি যমও কানা হয়ে গেল—

মার খেয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল চাঁপা।

—ও মা, আমাকে মেরে ফেললে রে, আমাকে মেরে ফেললে—

সুভদ্রা দেবীর চোখে তখন সবে মাত্র একটু তন্দ্রা নেমেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওই আকাট চিৎকার। সুভদ্রা দেবী উঠে বসলেন। বললেন—কি হলো রে চাঁপা? হলোটা কি? চেঁচাচ্ছিস কেন? এ তো বড় জ্বালালে দেখছি—

ঠিক তখনই দৌড়তে দৌড়তে চাঁপা এসে সুভদ্রার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বললে—দেখ না মা, ও আমাকে মারছে—

—কে মারছে তোকে। কে?

—ওই বুড়িটা—

ততক্ষণে কালিদাসীও একটা কাটারি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে মেয়ের পেছন পেছন। বলতে লাগলো—মর তুই মর, মর মুখপুড়ী, যম কি একবার তাকায়ও না তোর দিকে—

সুভদ্রা বললে—কি হলো? কি করেছে ও তা বলবি তো? অত গালাগাল দিচ্ছিস কেন, য়্যাঁ?

কালিদাসী বললে—দেখো না মা, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, ও আমার কাছে এসে তখন থেকে কেবল ঘ্যান-ঘ্যান করছে—

সুভদ্রার কোলের মধ্যে তখন চাঁপা মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করে আছে। সুভদ্রা জিজ্ঞেস করলে—কি রে, অত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিলি কেন? কি হয়েছে তোর?

মেয়ের হয়ে কালিদাসীই কথাটা খোলসা করে বললে। বললে—দ্যাখো না মা, আমি খেতে বসেছি, তখন থেকে কেবল আমাকে এসে বলছে—আমসত্ব খাবো, আমি আমসত্ব খাবো—

—আমসত্ব? আমসত্ব কোথায় পাবি তুই?

কালিদাসী বললে—ওই কথা কে বলবে ওই মুখপুড়ীকে?

—তা আমসত্বর কথা উঠলো কোত্থেকে?

কালিদাসী বললে—সে কথা ওই মুখপুড়ীকেই জিজ্ঞেস করো না তুমি? আমি কি আমসত্ব বানাই, না আমার আমসত্বর দোকান আছে যে আমি ওকে আমসত্ব দেবো—

সুভদ্রা বললে—কিন্তু এত জিনিস থাকতে হঠাৎ আমসত্ত্বর বায়নাই বা ধরলো কন ও ?

কালিদাসী বললে—কেন ধরলো তা ও-ই জানে। ওই মুখপুড়িকেই জিজ্ঞেস করো না সে-কথা।

এমন সময় অনিন্দ্যর স্কুলের বাসের হর্ন-এর শব্দ শোনা গেল।

তার মানে স্কুলের ছুটির পর অনিন্দ্য এতক্ষণে বাড়ি এলো।

তখন আর চাঁপাকে রাখে কে? সে এক দৌড়ে ছুটে গেল রাস্তায়। অনিন্দ্যর আগেই চাঁপা লাফাতে লাফাতে বাড়িতে এসে ঢুকলো। সে তখন আমসত্ত্ব চাটছে একমনে।

সুভদ্রা জিজ্ঞেস করলে—আমসত্ত্ব কে দিয়েছে রে তোকে? অনিন্দ্য?

—হ্যাঁ—

কোনও রকমে 'হ্যাঁ' কথাটা বলেই চাঁপা আবার সেই আমসত্ত্বটা চাটতে লাগলো—

সমস্ত রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল অনিন্দ্য বাড়িতে ঢুকতেই।

মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, তুই চাঁপাকে আমসত্ত্ব দিলি?

অনিন্দ্য বললে—হ্যাঁ, ও যে আমার কাছে আমসত্ত্ব খাবার বায়না ধরেছিল—

—কেন, তুই আমসত্ত্ব কোথা থেকে পাস? কে দেয় তোকে আমসত্ত্ব?

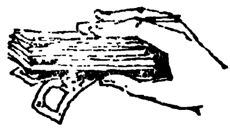
অনিন্দ্য বললে—আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে—

—তা চাঁপা কি করে জানতে পারলো সে কথা?

—আমি যে ওকে বলেছিলুম। তারপর থেকে রোজ রোজ কেবল আমার কাছে বায়না করে আমসত্ত্বর জন্য। তাই আজ ওকে এনে দিলুম—

মা বললে—তা ভারি তো চার পয়সার এক টুকরো একটা জিনিস তারই জন্যে এত হেনস্থা? তখন থেকে কালিদাসীকে একেবারে খেয়ে ফেললে ওই আমসত্ত্বর জন্যে!

কালিদাসীও বললে—তাই জন্যই ভাবছিলুম এত আমসত্ত্ব-আমসত্ত্ব করছে কেন মুখপুড়ি...



এতক্ষণ পরে মানুষ অনিন্দ্য সেন থামলেন।

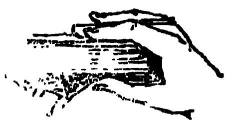
সামনে মহামান্য আদালতের ঘরে সবাই তখন উদগ্রীব হয়ে একমনে বিচারকের

ভাষণ শুনছে। চারদিকে সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। পেছনে বড় গঙ্গার ওপর একটা জাহাজ থেকে 'ভোঁ' শব্দ এক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে গেল। আওয়াজটা বন্ধ হতেই মানুষ অনিন্দ্য সেন আবার তাঁর ভাষণ আরম্ভ করলেন—এই আবহাওয়ার মধ্যেই আমি মানুষ হয়েছি। টাকা কখনওই আমার জীবনে কোনও সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায়নি। আমার মাস্টার সাহেব মোহম্মদ আশিকই আমার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন ওই MAN বইটা উপহার দিয়ে। তাই চিরকাল মনুষ্যত্ব জিনিসটার ওপরেই আমি অত গুরুত্ব দিয়েছিলাম—

আর দশটা কি পাঁচটা বাড়ির টিউটার যেমন মাস-মাইনের অঙ্কটা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন আমার মুসলমান মাস্টার সাহেব কিন্তু তেমন ছিলেন না। তিনিই আমাকে প্রথম ডায়েরী লিখতে অভ্যাস করান। সেই ডায়েরীতে আমাকে প্রতিদিন লিখতে হতো সারা দিন আমি ক'টা সত্যি কথা কিংবা ক'টা মিথ্যে কথা বলেছি। লিখতে হতো সকাল বেলা ক'টার সময় আমি ঘুম থেকে উঠেছি। লিখতে হতো সারা দিনে আমি কি কি ভালো এবং কি কি খারাপ কাজ করেছি।

আর শুধু তাই-ই নয়, বই পড়ার ব্যাপারটাও আমাকে লিখতে হতো সবিস্তারে। স্কুলের পড়ার বই ছাড়াও আমি বাইরের কি বই পড়েছি। আর লিখতে হতো যদি পড়ে থাকি তো সে-সব বইএর নাম-টাম কি—এই সব কথা।

আমি এখন কলকাতার আদালতের একজন মহামান্য বিচারপতি। আমার আদালতেই আসামী বা ফরিয়াদীদের শপথ নিতে হয় এই বলে যে, ঈশ্বরের নামে শপথ লইয়া বলিতেছি যে আমি এখানে সত্য বই মিথ্যা বলিব না। আর আমি সেই আদালতের একজন বিচারক হয়েও আজ ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে বলছি যে আমিও আজ সত্যি বই মিথ্যে বলবো না। আপনারা জেনে রাখুন যে আমি আজ বিচারক অনিন্দ্য সেন নই, আমি আজ শুধুই মানুষ অনিন্দ্য সেন···



একদিন স্কুল থেকে কলেজে পড়তে গেল অনিন্দ্য। তখন আর গৃহশিক্ষক রাখার প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। অনিন্দ্য তখন একজন বিবেকবান মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্লাসের অন্য ছেলেদের মত খেলাধুলোর সঙ্গে মেতে থেকেও লেখাপড়ার

দকেও যে সে অবহেলা করেনি তার কারণ এই মাস্টার সাহেব মোহম্মদ আশিফের আন্তরিকতা আর অনুপ্রেরণা।

মাস্টার সাহেব যে কেন তাকে অত স্নেহ করতেন তা কে জানে। এর পেছনে অনিন্দ্যর ভাগ্য-বিধাতার কোনও অমোঘ নির্দেশ ছিল কি না তাও জানা যায়নি।

দিবানাথবাবু ছেলেকে বলেছিলেন—মাস্টার সাহেবের কাছে এখনও পড়বে তো?

অনিন্দ্য বলেছিল—এখন আর তার দরকার হবে না—আমি নিজেই আমার পড়া-লেখার কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো—

কিন্তু দিবানাথবাবু বলেছিলেন—ও-কথা বলছো কেন? তুমি কি টাকার কথা ভাবছো? তোমার লেখা-পড়ার ব্যাপারে বা টাকা খরচ করার ব্যাপারে আমার কিন্তু কোনও কুণ্ঠা নেই। তুমি যতদূর লেখা-পড়া করতে চাও আমি তার সব-কিছু সুযোগ-সুবিধে তোমাকে দেবো—

তবু অনিন্দ্যর মনে একটু একটু সঙ্কোচ ছিল।

বাবা বললেন—তোমার যদি সঙ্কোচ থাকে তো বলো, আমি এখনি চিঠি লিখে কে আনাচ্ছি—

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। মাস্টার সাহেব মোহম্মদ আশিফকে গিয়ে ডেকে আনলে বাড়িতে। বললে—বাবা চান, আপনি এখনও আগেকার মত আমাকে পড়ান—

শুধু পড়ানো নয়, তার সঙ্গে ডায়েরী লেখাটাও সমান তালে চলতে লাগলো। দিবানাথবাবু মাস্টার সাহেবকে বলে দিলেন—আপনার ওপরই আমার অনিন্দ্যকে ছেড়ে দিলাম মাস্টার সাহেব, দেখবেন ও যেন বিপথে না চলে যায়। আজকাল তো সমাজের আবহাওয়া তেমন ভালো নয়—

সমাজের আবহাওয়া যে কবে ভালো ছিল তাও কেউ কোনওদিন গবেষণা করে আবিষ্কার করতে পারেনি।

এমন কি কালিদাসীর ছোট মেয়েটাকেও তখন থেকে সাবধান করে দিলেন দিবানাথবাবু। কালিদাসীকেও বলে দিলেন—খোকার পড়ার সময় তোমার মেয়ে তাকে অত বিরক্ত করে কেন বলো তো? তুমি তোমার মেয়েকে একটু সামলে রাখতে পারো না?

কিন্তু চাঁপা তেমন মেয়ে নয় যে তাকে অত সহজে সামলানো যাবে। বাড়ির একবারে চিলে কোঠার ঘরে দিবানাথবাবু ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যে-কোনও ছাত্রের পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা। খোলা জানালা দিয়ে সারা কলকাতা শহরতলীটা স্পষ্ট দেখা যাবে, আলো হাওয়া অফুরন্ত। আশে-পাশের রাস্তার গাড়ি চলার শব্দ কানে আসবে না। যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি একমনে নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকো। শুধু খাওয়া আর কলেজ যাওয়ার সময় নিচেয় নামতে হবে।

সেদিন ওই রকম এক মনে অনিন্দ্য পড়ছে। হঠাৎ কোথায় যেন একটা বেড়াল ডেকে উঠলো—মিউ—

এত ওপরে বেড়াল কোথা থেকে এলো? এখানে তো খাবারের কিছু আয়োজন নেই।

আবার বেড়ালের ডাক—মিউ—

অনিন্দ্য ঘর থেকে বাইরে এলো। সত্যিই তো, এখানে এত ওপরে বেড়াল-এলো কোথা থেকে?

আসল রহস্য এক মুহূর্তেই উদ্ঘাটিত হয়ে গেল চাঁপার সোল্লাস হাসিতে। হাসিতে সে তখন ফেটে পড়ছে।

—কেমন ঠকিয়েছি—কেমন ঠকিয়েছি—

অনিন্দ্য রেগে গেল। বলে উঠলো—আমার সঙ্গে ইয়ারকি? দেখছিস না আমি লেখা-পড়া করছি—

তখন চাঁপার কত আর বয়েস। কিন্তু ওই বয়েসেই সে দুষ্টুমিতে পেকে গিয়েছিল। আর তার অনিন্দ্যদার মত বয়স্ক ছেলেকে যে সে নির্বোধ প্রতিপন্ন করতে পেরেছে, এই আনন্দেই সে তখন একান্ত মশগুল।

অনিন্দ্য তখন বলে উঠলো—এখেনেও তুই আমাকে বিরক্ত করতে এসেছিস? মা'কে বলে দেবো—

কিন্তু কে তখন আর তার কথা শোনে! অনিন্দ্যকে যে চাঁপা ঠকাতে পেরেছে এটা কি চাঁপার কম কৃতিত্বের পরিচয়!

চাঁপা উল্টে অনিন্দ্যকেই অভিযুক্ত করে বলে উঠলো—তুমি যেমন আমাকে চকোলেট কিনে দাওনি, আমিও তেমনি তোমাকে ঠকিয়েছি।

অনিন্দ্য বললে—এই তো সেদিন তোকে আমসত্ত্ব কিনে দিলুম—

চাঁপা বললে—সে তো অনেক দিন আগে। তারপরে যে তুমি বলেছিলে চকোলেট কিনে দেবে আমাকে—

অনিন্দ্য এবার স্বীকার করলো নিজের দোষটা। বললে—সত্যিই রে, একেবারে ভুলে গিয়েছি। আজ ঠিক কিনে আনবো—

-ঠিক বলছো তো? না কি আবার ভুলে যাবে?

—না, কথা দিচ্ছি, এবার ঠিক কিনে দেবো, আর ভুলে যাবো না—

একটু আদর বা একটু মিষ্টি ব্যবহার পেলেই চাঁপা একেবারে গলে যেতো।

বললে—ঠিক বলছো তো? তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ কিন্তু, মনে থাকে যেন···

হঠাৎ নিচের থেকে মা'র গলা শোনা গেল—কই রে চাঁপা, কোথায় গেলি তুই মুখপুড়ি—

অনিন্দ্য বললে—ওই, শুনছিস তো? এবার আবার সেদিনকার মত পিঠের ওপর গুম্‌গুম্ করে কিল পড়বে। পালা শীগগির, পালা—

আসলে চাঁপা তার মা'কে ভয়ও করতো খুব। একটু কিছু অন্যায় করলেই চাঁপার পিঠে মা সত্যি-সত্যিই গুম্ গুম্ করে কিল মারতো। মারতে মারতে মেয়েকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিতো।

তখন সুভদ্রা এসে বাঁচাতো চাঁপাকে। চাঁপাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতো। পিঠের ওপর আদর করে হাত বুলিয়ে দিতো আর কালিদাসীকে বকাবকি করতো—তুমি কেমন মা গো কালিদাসী, মেয়েটাকে মেরে একেবারে কপালটা ফুলিয়ে দিয়েছ গা? এক ফোঁটা মেয়েকে এমন করে মারতে আছে? আহা, আয় আমার কোলের কাছে আয়, কোথায় মেরেছে তোর মা, দেখি?

ওদিকে কালিদাসীও তেমনি! রাগ তারও কম নয়। বলতো—ওই মেয়ে না থাকলে কি আমার ভাবনা! ওই বাঁদরীর জন্যেই তো আমার যত জ্বালা। এই বয়েসে কোথায় একটু আরাম করবো, তা নয়, মেয়ের বায়না শুনতে শুনতেই আমার প্রাণ গেল!

সত্যিই, কালিদাসীর যত কিছু জ্বালা ওই বাপ-মরা মেয়েটার জন্যেই। কতদিন আগে চাঁপার বাপ মারা গিয়েছে, কিন্তু তার জন্যে কালিদাসীর অভিযোগের যেন আর অন্ত নেই। যেন তার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূলে সেই মৃত মানুষটাই দায়ী, আর কেউ নয়। নিজে সে না-হয় মরলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে নিয়েই মরলে পারতো। তার মত বিধবার ওপর ওই মেয়েটার ভার সে মানুষটা দিয়ে গেল কেন? একবার ভাবলেও না যে কোথা থেকে ওই নাবালিকা মেয়েটার ভাত-কাপড় আসবে! কে তাদের খাওয়াবে?

এই সব অভিযোগই সারাদিন কালিদাসীর মুখ থেকে বেরোতো। আর তখন তা আশেপাশের বাড়ির লোকের কানে গিয়ে পৌঁছুতো।

বিশেষ করে কানে গিয়ে পৌঁছুতো চরণ দাসের।

চরণ দাস আর কোনও বাড়িতে ভিক্ষে পাক আর না পাক এ বাড়িতে ছিল তার ঢালোয়া নেমন্তন্ন।

—ওরে কালিদাসী, ওই বাবাজী এসেছে, ওকে দুটো পয়সা আর চাল দিয়ে দে—

চরণ দাস এ-বাড়ির নিত্য দিনের ভিক্ষুক। অবশ্য সত্যি সত্যি আর সে কিন্তু ভিক্ষুক নয়। সে বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষে করে না, তার বদলে সেবা পায়। সে এসেই খঞ্জনি বাজিয়ে ভগবানের নাম করে। তার মানে নাম-গান। নাম-গানের বদলে গৃহস্থরা তাকে সেবা দেয়।

তার গলাটাও ভারি মিষ্টি। বাড়িতে ঢোকবার মুখেই এক-একদিন কালিদাসীর গলা শুনতে পায়। চাঁপার কান্নাও শুনতে পায় এক একদিন।

চরণ দাস বলে—ওকে অত মারছো কেন মা? ছোট মেয়েকে কি অত মারতে আছে?

চরণ দাসের গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা মেয়ের ঝগড়া থেমে যায়।

চাঁপা দৌড়তে দৌড়তে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

চরণ দাস বলে—কাঁদছিলে কেন গো মা-জননী—

চাঁপা বলে—মা যে মারছিল—তুমি একটা গান গাও না বাবাজী—

চরণ দাস জিজ্ঞেস করে—কোন্ গানটা গাইবো তুমি বলে দাও মা-জননী—

মা-জননী বলে—সেই যে সেই—'কার ভাবে নদেয় এসে—'

চরণ দাস খঞ্জনি বাজিয়ে গাইতে আরম্ভ করে ঃ

কার ভাবে নদেয় এসে, কাঙাল বেশে
হরি হয়ে বলছো হরি
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব
তাও কিছু বুঝতে নারি।
কোথা তোমার মোহন চূড়া, পীতধড়া
ভঙ্গী ত্রিভঙ্গ মুরারী
কোথা তোমার ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল
কোথা সেই নবীন বাছুরী
এখন তোমার মা যশোদা রইল কোথায়
শূন্য করে ব্রজপুরী।
কোথায় তোমার গুঞ্জমালা, শিকায় তোলা
কোথায় তোমার রাইকিশোরী
কোথায় তোমার সখী সখা সেই বিশাখা
কোথায় অনঙ্গ মঞ্জরী
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা
নদেয় হলে দণ্ডধারী
কাঙাল চরণ বলে শ্রী রূপচাঁদের
যুগল চরণ সাধন করি।

এ-রকম গান শুনলেই সমস্ত বাড়িতে যেন শান্তি নেমে আসতো। চাঁপা মাটির সরায় করে চাল নিয়ে আসে। চালের সঙ্গে সঙ্গে কিছু আনাজ-পাতিও আনে। হয় এক ছড়া কাঁচকলা, কি বেগুন মুলো। কিংবা কপি কড়াই শুঁটি। আবার কখনও বা একটা শিশিতে ভরা কিছুটা সরষের তেল, আর কাগজে মোড়া কিছুটা নুন। আবার পুজোর সময়ে একটা লাল নরুণ-পাড় মিলের ধুতি, আর তার সঙ্গে হয়ত একটা গামছা—

গান শেষ করে বাবাজী চলতে আরম্ভ করে।

বলে—জয় রাধে—



অনিন্দ্য জানতো যে তাকে একদিন মাস্টার সাহেবের আদর্শ অনুযায়ী একজন মানুষ হতে হবে। যে-মানুষ প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নিত্য-কর্মপদ্ধতি হিসেবে বাজারে গিয়ে রান্নার উপকরণ কিনে এনে দেয়, তারপর রান্না খাবার খেয়ে বাসে বা অন্য কোনও যান-বাহনে আরোহণ করে কর্মস্থলে যায়, আর তারপর একদিন জৈব প্রয়োজনে সন্তান উৎপাদন করার তাগিদে সংসার পাতে, আর তারপর কর্মস্থল থেকে অবসর নিয়ে পেনসন ভোগ করে একটা নির্দিষ্ট দিনে এই বিশ্ব-বিধাতার সংসার থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যায়, সে-মানুষ তার আদর্শ মানুষ নয়। মাস্টার সাহেবের আদর্শ মানুষ মাত্র সে-ই যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা ভেবে এমন ভাবে জীবন যাপন করবে এবং এমনভাবে কোনও কর্ম করবে যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কল্যাণ সাধনের সহায়ক হবে।

মাস্টার সাহেব বলতেন—আমি চাই তুমি সেই রকম একজন মানুষ হবার সাধনায় জীবনপাত করো।

অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করতো—সে-রকম মানুষ হতে গেলে আমাকে কি কি করতে হবে?

মাস্টার সাহেব বলতেন—আমি তো সেই জন্যেই তোমাকে ওই বইটা উপহার দিয়েছি। ওই সব মহাপুরুষেরা যে-ভাবে জীবন-যাপন করেছেন তুমিও সেইভাবেই জীবন-যাপন করবে।

অনিন্দ্যর তবু সংশয় ঘুচতো না।

বলতো—কিন্তু তাঁদের সমসাময়িক সমাজ তো কেবল তাঁদের শত্রুতাই করেছে। আবার অনেককে সে-সমাজ আবার খুনও করেছে।

—কিন্তু এখন? এখনকার সমাজ কি আর তাঁদের শত্রুতা করে? এখন তো সমাজ তাঁদের পুজো করে, তাঁদের ছবিতে ফুলের মালা দিয়ে তাঁদের সম্মান করে—

অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করতো—তা এমন হয় কেন?

মাস্টার সাহেব বলতেন—এমন হয় কারণ মহাপুরুষদের মহত্ত্ব নিজের সমকালের মানুষ নিজেদের নিচু মানদণ্ডের মাপে বিচার করতে যায় বলে। মানদণ্ডই যদি ভেজাল হয় তো সঠিক মাপ হবে কি করে? যীশুখৃষ্টই বলো আর সোক্রেটিসই

বলো, তাঁরা যদি এখন এযুগে তাঁদের তখনকার বলা কথাগুলো বলেন তো এখনকার সমাজ তাঁদের আর ক্রুশবিদ্ধও করবে না, কিংবা হেমলক্ বিষ দিয়ে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডও দেবে না—

মনে আছে, অনিন্দ্য সেই দিনই বুঝে গিয়েছিল যে মাস্টার সাহেবের বলা আদর্শ মানুষ হতে গেলে তাকে তার সমাজের মানুষের কাছ থেকে কেবল ঘৃণা নিন্দা আর শত্রুতাই পেতে হবে। ঘৃণা নিন্দা আর শত্রুতা পেতে অস্বীকার করলে তার দ্বারা আর মাস্টার সাহেবের মানদণ্ডে আদর্শ মানুষ হওয়া সম্ভব হবে না।

তাই তখন থেকেই অনিন্দ্য সেন ঘৃণাকে কখনও ঘৃণা করেননি, নিন্দুককে কখনও নিন্দে করেননি আর শত্রুরও কখনও শত্রুতা করেননি।

সেই তখন থেকেই বলতে গেলে অনিন্দ্যর শুরু হলো একক যাত্রা।

জীবনে যাকে একলা চলতে হয় সেই বোঝে দলহীন একক-যাত্রার কি দুর্বিসহ যন্ত্রণা। আগে তবু ক্লাব ছিল। বন্ধু-বান্ধব ছিল। ছিল আড্ডা, ছিল সুখ-দুঃখ ভাগ করে ভোগ করবার সঙ্গী সাথী। তারপর তাও গেল। বন্ধু-বান্ধবরা আর তার নাগাল পায় না। তারা বাড়িতে এসে দেখা করতে এলে দেখা না পেয়ে ফিরে যায়।

সুভদ্রাও দেখতে পেলো ছেলের পরিবর্তনটা। ছেলে যেন আরো দূরে চলে গেছে। কাছে থেকেও দূরে, হাতের মুঠোর মধ্যে থেকেও হাতের মুঠোর বাইরে।

দিবানাথবাবুও তা দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন।

সুভদ্রা জিজ্ঞেস করলে—তুমি লক্ষ্য করেছ অনিন্দ্য যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে—

—অন্য রকম মানে?

সুভদ্রা বললে—আগে কত ছটফটে ছিল, কত হাসি-ঠাট্টা-গল্প-তামাশা করতো। আজকাল কেমন একটু গম্ভীর-গম্ভীর—

—ফুটবল খেলতেও যায় না নাকি?

—কই, আর তো যায় না দেখছি। এখন তো মাস্টার সাহেবকে আর ছাত্রের জন্যে একলা বসে বসে অপেক্ষা করতে হয় না।

প্রথম দিকে এ নিয়ে দিবানাথবাবু তেমন মাথা ঘামাতেন না। বোধহয় সামনে পরীক্ষা বলে একটু দুর্ভাবনা হয়েছে। কিন্তু না, তা নয়। যে ক'দিন ক্লাস থাকে সে ক'দিন কলেজ থেকে একেবারে সোজা বাড়ি চলে আসে। আগে কখনও তা করতো না। কোথায় কাদের সঙ্গে মিশতো, কোন্-ধরনের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতো তা জিজ্ঞেস করলেও বলতো না। তখন দিবানাথবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো, তিনি জানতেন যে ওই বয়েসটা বড় খারাপ। খারাপ ছেলেরা যদি সঙ্গী হয় তো খারাপ পথে চলে যেতে পারে। বিশেষ করে একবার যদি কোনও বিয়ে-না হওয়া মেয়েরা অনিন্দ্যকে পেয়ে বসে তো ওকে পথে বসিয়ে ছেড়ে দেবে।

মাস্টার সাহেবকে একলা কোথাও পেলে দিবানাথবাবু ছেলের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন—মাস্টার সাহেব, খোকা কেমন লেখা-পড়া করছে ?

মাস্টার সাহেব অনিন্দ্য সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত হতেন। বলতেন—আজকাল অনেকটা শুধরে গিয়েছে—

—লেখা-পড়া ?

—খুব ভালো। পুরোন বন্ধু-বান্ধবরাও কেউ আর বাড়িতে আসে না। শুনেছি ফুটবল-টুটবলও খেলতে যায় না আর। এবার পরীক্ষাতেও তো খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। আমি ওর ব্যাড্ হ্যাবিটস্‌গুলোও সব দূর করে দিয়েছি—

দিবানাথবাবু জিজ্ঞেস করেন—কি করে দূর করে দিলেন ?

মাস্টার সাহেব বলেন—ভালো ভালো বই পড়তে দিয়ে—

—কি বই ? উপন্যাস ?

—না, না, উপন্যাস-টুপন্যাস একেবারে পড়তে বারণ করে দিয়েছি। আমি আমার লাইব্রেরী থেকে ভালো ভালো ক্লাসিক ওয়ার্কস এনে ওকে পড়তে দিই—

দিবানাথবাবু মাস্টার সাহেবের কথা শুনে নিশ্চিত হন। তারপর বলেন—ওদের কলেজে তো কো-এডুকেশন সিস্টেম, কোনও মেয়ে টেয়ের সঙ্গে মেলা-মেশা করে না তো ?

মাস্টার সাহেব বলেন—তা ঠিক বলতে পারবো না। আমি যে-সব বই ওকে পড়তে দিয়েছি তাতেই ওর চরিত্র-গঠন হয়ে যাবে। সে-সব পড়লে আর কোনও ভয় নেই ওর—

দিবানাথবাবু বলেন—তাই তো আমি বাড়ির চিলে-কোঠার ঘরে ওর লেখা-পড়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি—

অনিন্দ্যকে নিয়ে যখন তার গুরুজন আর অভিভাবকরা মিলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তিত, তখন বোধহয় তার ভাগ্য-বিধাতা তার জন্যে অন্য এক বিধান তৈরি করছেন। যে বিধান অলঙ্ঘ্য, যে বিধান অমোঘ।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—এ তিনের বিধান নাকি অদৃষ্ট। এ কারোর ব্যক্তিগত বা সমাজগত বিধান নাকি মেনে চলে না। তবু তো মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে, তবু তো মানুষ অক্লান্ত সংগ্রাম করে।

শুধু দিবানাথবাবু কি সুভদ্রা কি অনিন্দ্য নয়। শুধু কালিদাসী কি চাঁপাও নয়, অথবা শুধু মাস্টার সাহেবও নয়। এমন কি শুধু চরণ দাস বাবাজীও নয়। সকলের জন্যেই এ-বিধান অলঙ্ঘ্য। অথচ এদের সবাইকে নিয়েই এই কাহিনী। এদের সবাইকে ঘিরেই এক ষড়যন্ত্র আর রোমাঞ্চের দুর্ভেদ্য জাল সৃষ্টি করে এদের সকলের সৃষ্টিকর্তা তাঁর আপন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে গেলেন কেন ?

এদের সঙ্গে আর একজন কুশীলবও জড়িত আছেন। তিনি হলেন ডাক্তার পরমার্থ

বোস। তিনি হলেন এ কাহিনীর অন্যতম প্রধান আসামী। তিনি না থাকলে এ-কাহিনী লেখার প্রয়োজন অসমাপ্ত থাকতো।

কিন্তু ডাক্তার পরমার্থ বোস বা আর একজন নারী আসামী কল্যাণী সেনের কথা এখন উহ্য থাক। তাদের কথা যথাস্থানে বা যথাসময়ে বলা যাবে।

তাই তো গোড়াতেই বলেছি যে এই কলকাতায় যা চলছে বা যা ঘটছে তার সব খবর কি খবরের কাগজে বেরোয়? না, বেরোয় না। কারণ সব খবর যদি প্রকাশ করতে পারা যেতো তাহলে খবরের কাগজের সীমিত পরিসরের মধ্যে তা পরিবেশন করা সম্ভব হতো না। কোনও দেশের কোনও সংবাদপত্রেই তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

তখনও মহামান্য আদালতের একটা কক্ষে বিচারক অনিন্দ্য সেনের কথা যখন সবাই শুনছে তখন চারিদিকে সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা।

বিচারক তখনও বলে চলেছেন—এতদিন বিচারক অনিন্দ্য সেন মানুষের বিচার করে এসেছে, আজ মানুষ অনিন্দ্য সেন বিচারক অনিন্দ্য সেনের বিচার করবে। আপনারা তার অকপট আত্ম স্বীকৃতি শুনুন···আমি আজ আমার জীবনের কোনও কথাই গোপন করবো না, আমি আপনাদের সব অকুণ্ঠিতভাবে বলে যাবো—



প্রত্যেক মানুষের জীবনে একবার-না-একবার জোয়ার আসেই। যে-মানুষ সেই জোয়ারের সুযোগ নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তার পক্ষেই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে ওঠা সম্ভব হয়। তাকেই অন্য মানুষেরা ধন্য ধন্য করে অভিনন্দিত করে।

অনিন্দ্য সেনেরও তাই হয়েছিল।

দিবানাথবাবুর আত্মীয়স্বজন বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু ছিল না। অফিসের কিছু সহকর্মীরাই বলতে গেলে তাঁর নিকট-আত্মীয়ের মতন ছিল।

অফিসের সহকর্মীরাই বলতো—আপনি তো ভাগ্যবান পুরুষ মশাই, আপনার একটা সোনার টুকরো ছেলে। আপনি অনেক ভাগ্য করে এসেছেন মশাই—

আবার বাবার অফিসের বড় সাহেব একদিন হঠাৎ নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা মিস্টার সেন, আপনার ছেলে এখন কি করছে?

—এই তো স্যার এবার বি. এ. পাস করেছে—

—কি রকম রেজাল্ট করেছে?

—এক নম্বরের জন্যে ফার্স্ট হতে পারেনি। ফাইনালে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে।

—এখন কি করবে সে?

—তা জানি না স্যার। ছেলের একজন মাস্টার সাহেব আছেন, তিনি যা বলবেন তাই-ই হবে।

বড় সাহেব বলেছিলেন—আপনি এই অফিসে তাকে ঢুকিয়ে দিন, আমি তাকে গোড়াতেই একেবারে বড় অফিসারের পোস্টে বসিয়ে দেবো—তবে মানে স্টার্টিং-এই একেবারে আড়াই হাজার টাকা স্যালারি পাবে সে—

অফিসসুদ্ধ লোক সেদিন দিবানাথবাবুর ভাগ্যের কথা ভেবে তাঁর ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। সবাই ভেবেছিল, আহা, আমাদের যদি এমন সৌভাগ্য হতো!

বাড়িতে এসে কথাটা সুভদ্রাকে বলেছিলেন দিবানাথবাবু।

সুভদ্রা বলেছিল—তা দেখ তোমার ছেলেকে বলে। সে কি রাজি হবে?

—কেন, রাজি হবে না কেন? আমার বয়েস হয়েছে, আমি তো কিছুদিন পরেই চাকরি থেকে রিটায়ার করবো। তখন? তখন কি হবে? কোথা থেকে কেমন করে এ-সংসার চলবে?

সুভদ্রা বলেছিল—তোমার ছেলে কি সেই রকম যে আমাদের দুঃখ কষ্ট বুঝবে? ও কোথায় কখন যায় তাও তো কিছু বোঝা যায় না।

দিবানাথবাবু বলেছিলেন—ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিলে জব্দ হতো। তখন বুঝতো কত ধানে কত চাল।

সুভদ্রা বলেছিল—বিয়ে কি করবে? ও যা একগুঁয়ে ছেলে। ওর মাস্টার সাহেব ছাড়া আর কারো কথাই তো ও শোনে না।

অনিন্দ্যকেও কথাটা বলেছিলেন দিবানাথবাবু। অফিসের বড় সাহেবের প্রসঙ্গটাও ছেলেকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—এ-রকম চান্স রোজ রোজ কারোর জীবনে আসে না!

অনিন্দ্য প্রথমে কিছু জবাব দেয়নি। অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল।

দিবানাথবাবু বলেছিলেন—আর আমার কথাটাও একবার ভাবো। আমি আর কতদিন চাকরি করবো। আমারও তো রিটায়ার করবার সময় হয়ে আসছে। তখন তোমার চাকরির জন্যে আমি কার কাছে বলবো?

অনিন্দ্য বলেছিল—আমার আরো পড়বার ইচ্ছে আছে—

—আরো কি পড়বে?

—ভাবছি সাইকোলজিতে এম. এ. পড়বো।

—কিন্তু তারপর?

—তারপর ভাববো আমি কি করবো।

—তবু এখন থেকেই তো একটা রাস্তা ঠিক করে নিতে হবে তোমাকে। তা এম. এ. পাস করে কি তুমি প্রোফেসারি করতে চাও ?

—না।

—তাহলে ?

অনিন্দ্য বলেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তো ল'টাও পড়ছি। ল'লাইনটাও আমার খুব ভালো লাগে।

—তার মানে, তুমি কি এম. এ. বি. এল. হয়ে কোর্টে প্র্যাকটিস করতে চাও ?

অনিন্দ্য বলেছিল—তাও এখনও কিছু ভাবিনি—

দিবনাথবাবু বলেছিলেন—এখনও যদি না ভাবো তাহলে কবে ভাববে ? মানুষ তো গোড়া থেকেই একটা লাইন ঠিক করে নিয়ে এগোয়! আমি নিজে যখন তোমার বয়েসী ছিলুম তখন থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলুম পরে আমি কি হবো! আর তা ছাড়া আমি অফিসে থাকতে থাকতে যা সুযোগ-সুবিধে পাবো, পরে তো আর তা পাবো না—

দিবানাথবাবুর এ-সব যুক্তিতেও অনিন্দ্যর কোনও সুরাহা হয়নি। অনিন্দ্য যেমন কলেজে যাচ্ছিল তেমনি ইউনিভার্সিটিতেও যেতে লাগলো। রুটিন বাঁধা জীবন। পড়তে যায় আর পড়াশোনা শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসে। পৃথিবীতে যে রোজ এত রকমের ওলট-পালট অদল-বদল চলছে তার দিকে চেয়ে দেখেও না সে!

মাস্টার সাহেব নিজেই আগে ছাত্র ছিলেন। ছাত্র অবস্থা ছেড়ে চাকরিতে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু ছাত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তখনও ছিন্ন হলো না। এখন সময় পেলেই অনিন্দ্য মাস্টার সাহেবের বাড়িতে যেতো।

একদিন অনিন্দ্যই নিজে মাস্টার সাহেবের কাছে কথাটা তুললো।

—স্যার, বাবা আমাকে খুব বড়ো হতে বলছিলেন। 'বড়ো হওয়া' মানে কি ?

মাস্টার সাহেব মোহম্মদ আশিক বললেন—ডিক্সনারী দেখলেই তুমি তার মানে জানতে পারতে! আমাকে মানে জিজ্ঞেস করছো কেন ?

অনিন্দ্য বললে—'বড়ো হওয়া' কথাটার মানেই তো 'ছোট হওয়া' বলে যে একটা জিনিস আছে, তা স্বীকার করে নেওয়া! তাই নয় কি ?

মোহম্মদ আশিক বললেন—তা তো বটেই। বড়োর বড়োত্বও তাই এক-রকমের স্বার্থপরতা। যে বড়ো হতে চাইবে সে বরাবরই ধরে নেবে যে তার আশে পাশে যারা থাকবে তারা তার চেয়ে ছোট হয়ে থাকুক। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বড়ো বলে ঘোষিত হয়েছে, তারা কখনও নিজেরা বড়ো হতে চায়নি। তারা শুধু চেয়ে গেছে ভালো হতে। তাই বড়ো হতে চাওয়াও এক-রকমের স্বার্থপরতা।

কথাটা বরাবর অনিন্দ্যর মনে ছিল।

তাই দিবানাথবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলেছিল—আমি বড়ো হবো না, আমি বড়ো হবো না, আমি ভালো হবো—

দিবানাথবাবু বলেছিলেন—যদি তোমার বেশি টাকা না হয় তাহলে তোমার ভালো মানুষ হয়ে কি লাভ? টাকাটাই তো সংসারে একমাত্র আসল জিনিস—

অনিন্দ্য বলেছিল—আমি তা বিশ্বাস করি না—

—তুমি বিশ্বাস করো আর না করো তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ পৃথিবী তো তোমার হুকুম মেনে চলবে না। সে শুধু টাকাওয়ালা মানুষের কথায় উঠবে বসবে, এটা মনে রেখো!

দিবানাথবাবু আরো বললেন—আজকাল যাঁরা পৃথিবীটা চালাচ্ছেন তাঁরা সবাই খৃীষ্টান। এটা তো মানো?

অনিন্দ্য বললে—হ্যাঁ—

দিবানাথবাবু বললেন—অথচ তাঁদের গুরু যীশু খৃষ্টের একটা পয়সাও ব্যাঙ্কে ছিল না। কিন্তু তাঁর নাম করে যাঁরা এখন পৃথিবী চালাচ্ছেন তাঁরা সবাই পয়সা ওয়ালা লোক। তাই জন্যেই বলছি তুমি যদি গুরু হতে চাও তাহলে পয়সা না থাকলেও চলবে, কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তোমাকে পয়সাওয়ালা লোক হতেই হবে। যে গুরুর যত বড়লোক শিষ্য আছে, সেই গুরুর তত খাতির—

অনিন্দ্য এ-কথার জবাবে বলেছিল—আমি গুরুও হতে চাই না, কোনও গুরুর শিষ্যও হতে চাই না।

—তাহলে তুমি কি হতে চাও?

অনিন্দ্য বলেছিল—আমি মানুষ হতে চাই—

কথাটা শুনে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন দিবানাথবাবু। বলেছিলেন—তোমার মাস্টার সাহেবই দেখছি যত নষ্টের মূল হয়েছে। তাকে তোমার মাস্টার রাখাটাই তখন আমার অন্যায় হয়েছিল—

এর পরে এ-প্রসঙ্গ নিয়ে ছেলের সঙ্গে বাবার আর কখনও কোনও কথাই হয়নি। অনিন্দ্য তার নিজের ইচ্ছেমত সাইকোলজি নিয়েই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। যে ছেলে জীবনে অনেক টাকার মালিক হতে অস্বীকার করে তার মাথায় যে কিছু গোলমাল আছে এ সম্বন্ধে দিবানাথবাবুর আর কোনও সংশয়ই রইলো না।

কিন্তু দিবানাথবাবুর একটা মহা সৌভাগ্য যে শেষ জীবনে ছেলের চূড়ান্ত অধঃপতন তাঁকে চর্মচক্ষে দেখে যেতে হয়নি।

অনিন্দ্য একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে চাকরির চেষ্টা না করে কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করে দিলো। ওকালতি জিনিসটা ভালো কিন্তু সে প্রফেসনে একদিনে কখনও উন্নতি করা যায় না। সেটা অনেক সময়সাপেক্ষ। প্রথমে কোনও সিনিয়ার এ্যাডভোকেটের কাছে শিক্ষানবিশি করতে হয়। তারপর তোমার অধ্যবসায়, আন্তরিক নিষ্ঠা আর ভাগ্য।

দিবানাথবাবুর পরমায়ু তখন ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছিল। তিনি ছেলের হালচাল দেখতেন আর মনে মনে কষ্ট পেতেন।

সুভদ্রাকে প্রায়ই বলতেন—শেষ জীবনটায় মানুষ একটু আরাম পেতে চায়, আমার কিন্তু তা হলো না। আমি তো কোনও রকমে জীবনটা কাটিয়ে গেলুম। এখন কেবল তোমার কথাই ভাবছি।

সুভদ্রা বরাবরই কম কথার মানুষ ছিল। বলতো—তুমি আর ভেবে কি করবে? ভগবান আছেন মাথার ওপর, তিনি যেমন রাখবেন তেমনিই থাকবো—

কিন্তু ভগবানকে তো চোখে দেখা যায় না। তাই শেষ জীবনে যা অদৃশ্য তার ওপরে ভরসা রাখা যায় না।

দিবানাথবাবু আরো বলতেন—অনিন্দ্যর সঙ্গে একটা ভালো মতন মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো—তাহলে ছেলে তোমাকে না দেখুক ছেলের বউ তোমাকে একটু সেবা করতো—

সুভদ্রা বলতো—আমার কথা তুমি অত ভেবো না—

সুভদ্রার কথা ভাবতে বারণ করলেই কি কেউ সে-ভাবনা থেকে মুক্তি পায়? আসলে দিবানাথবাবুও তো একাধারে যেমন একজন মানুষ, আবার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একজন বাবাও তো বটে। ছেলের জন্যে বাবা ভাববে না তো কে ভাববে?

অনিন্দ্য তখন তার ওকালতি আর মক্কেল নিয়ে উদয়াস্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকাল বেলাই সিনিয়ারের বাড়িতে যায় আর সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে তখনই আবার চলে যায় কোর্টে। কোর্ট থেকে ফিরে আবার যেতে হয় সিনিয়ারের বাড়িতে। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়।

যেদিন কোর্ট ছুটি থাকে সেই দিন মাত্র দিবানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয় কিছুক্ষণের জন্যে।

অনিন্দ্যকে ডেকে দিবানাথবাবু একদিন বললেন—জানো, কাল আমি রিটায়ার করেছি—

অনিন্দ্য বললে—ভালোই তো হলো। এবার আপনি একটু বিশ্রাম পাবেন—

দিবানাথবাবু বললেন—কিন্তু সংসার তো আমাকে বিশ্রাম দেবে না—

অনিন্দ্য বললে—আমি তো রয়েছি, আপনি অত ভাবছেন কেন?

দিবানাথবাবু বললেন—তুমি যদি আমার অফিসের চাকরিটা নিতে তাহলে আমাকে কিছুই ভাবতে হতো না। কিন্তু তোমার ওই এক কথা। তুমি 'মানুষ' হতে চাইলে বলেই আমার এত ভাবনা—

কথায় আছে স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য সম্বন্ধে মানুষ তো ছার, দেবতারাও কিছু বলতে পারেন না। মাস কয়েক বাদেই অনিন্দ্য বাবার হাতে এক হাজার টাকা তুলে দিয়ে বললে—এই টাকা ক'টা রাখুন আপনি। পরে আবার দেবো—

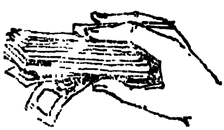
দিবানাথবাবু টাকা ক'টা হাতে নিয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিছু বোধহয় বলতেও চাইলেন, কিন্তু কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরোলো না। যখন কথা বলবার শক্তি এলো তখন দেখলেন অনিন্দ্য কখন সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ক্রমে ক্রমে দিবানাথবাবু লক্ষ্য করতে লাগলেন বাড়ির সামনের বাইরের ঘরে একটু একটু মক্কেলের ভিড় জমে। খালি আলমারিতে আইনের বাঁধানো বইগুলো ভর্তি হয়ে ঘরের শোভা বাড়ায়। সকাল বেলা তেমন ভিড় না হলেও সন্ধ্যের পর থেকে ভিড়টা একটু একটু করে সংখ্যায় বাড়ে।

দিবানাথবাবু নিজের মনে মনেই কেমন অবাক হয়ে যান। তাহলে তো অনিন্দ্যর এলেম আছে বলতে হবে। সে তো একেবারে অপদার্থ নয়। তা না হলে দিবানাথবাবুর হাতে যখন-তখন অতোগুলো করে টাকা দেয় কি করে? নিশ্চয় ভালো আয়ই হচ্ছে।

তখন আর অফিসে যেতে হয় না দিবানাথবাবুকে। অনিন্দ্য যখন কোর্টে চলে যায় তখন এক-একদিন তিনি ছেলের চেম্বারে গিয়ে ঢোকেন। চারদিকের ফাইল বই কাগজপত্র দেখে অবাক হয়ে যান। আবার যখন সন্ধ্যেবেলা ছেলের ঘরে মক্কেলের ভিড় হয় তখন নিঃশব্দে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেন। বাড়ির সামনেও কত বড় বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। বোঝা যায় ছেলের পসার হয়েছে খুব। নইলে ছেলের কাছে অত গাড়ি আসে কেন? মক্কেলরা যদি বড়লোকই হয় তো নিশ্চয় তারা আহাম্মক নয়।

ঠিক এই সময়েই কল্যাণী এসে গেল অনিন্দ্য সেনের জীবনে। সেই কল্যাণী—যে এই উপন্যাসের নায়িকা।



সমস্ত আদালত-কক্ষ তখনও একমনে সাগ্রহে শুনে চলেছে মানুষ অনিন্দ্য সেনের স্বীকারোক্তি।

অনিন্দ্য সেন বলে চলেছেন—ঠিক এই সময়েই হঠাৎ আমার বিয়ে হলো এক অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে। তার নাম কল্যাণী। বিয়ের আগে তাকে আমি কখনও দেখিনি। দেখতে সুন্দরী বলেই মনে হবে সকলের। পাত্রীর সন্ধান বাবাই করলেন। আমার কাছে বাবা একদিন বললেন—তুমি তো কখনও আমার কোনও কথাই শোননি।

এবার একটা কথা শুধু শোন। তুমি বিয়ে করো। এখন তোমার একটা বিয়ে করা দরকার—

আমি কি বলবো বুঝে পেলাম না।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন—কি, তুমি কোনও কথা বলছো না যে ?

আমি বললাম—আমি কি বলবো ?

বাবা বললেন—তোমারই বিয়ে, সুতরাং তুমি বলবে না তো কে বলবে ? তোমার মতের বিরুদ্ধে আমি তো কখনও কোনও কাজ করিনি। আমি তোমাকে আমার অফিসে চাকরি করে দিতে চেয়েছিলুম, তা তুমি নাওনি। তাই তোমার বিয়ের ব্যাপারেও আমি তোমার মত জানতে চাইছি। তুমি কি আমার পছন্দ-করা মেয়েকে বিয়ে করবে ? তোমার মুখ থেকে আমি 'হাঁ' কি 'না' শুনতে চাইছি—

আমি বাবার কথার উত্তরে বললাম—আমাকে দু'চার দিন ভাবতে একটু সময় দিন—

বাবা আমাকে ভাবতে সময় দিলেন।

আমার মন তখন অনেক মামলার নথি-পত্র নিয়ে ভারাক্রান্ত। তখন আমি আমার মক্কেলদের স্বার্থের কথা ভাববো না আমার বিয়ের কথা ভাববো ? বলতে গেলে নিজের সম্পর্কে আমি কখনও তেমন করে ভাবিইনি।

কিন্তু আমি নিজের বিয়ের সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত নেবো তা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

শেষে একদিন মা'কে নিরিবিলিতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—মা, তুমি বলে দাও আমি কি করবো ?

মা বললে—তুই তো উকিল মানুষ। এত লোকের এত সমস্যা নিয়ে তোকে দিনরাত ভাবতে হয়, এবার নিজের সমস্যা নিয়ে একটু ভাব না—

বললাম—পরের সমস্যা আর নিজের সমস্যা—ও দুটো কি এক ? তুমি আমাকে বলে দাও আমি কি করবো ? তুমি কি চাও আমি বিয়ে করি ?

মা বললে—দেখ আমরা তো চিরকাল বাঁচতে আসিনি। কেউই চিরকাল বাঁচতে আসে না। আমরা দু'জনেই একদিন এ-পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। তখনকার কথা ভাবো। তুমি তো তোমার মক্কেলের কথা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু তোমার বাড়িতে শান্তি থাকলে তবেই তো তুমি মন দিয়ে কাজ করতে পারবে। সে-শান্তি তখনই আসবে যখন তোমাকে দেখবার জন্যে সংসারে একজন লোক থাকবে। সে-লোক মানুষের স্ত্রী। যাকে আমাদের সমাজে বলা হয় গৃহলক্ষ্মী। সেই গৃহলক্ষ্মী এলেই সংসারে লক্ষ্মীশ্রী আসে। তা ছাড়া আমারও তো একটা সাধ থাকে। তোর বিয়ে দিয়ে আমিও দেখে যেতে চাই যে তুই সুখী হয়েছিস।

এর পরে আর বিয়ের ব্যাপারে কোনও আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

তারপরে একদিন আমার বিয়ে হয়ে গেল।

এরপর? এরপর কি হলো?

ভিড়ের মধ্যে আসামী পক্ষের এ্যাডভোকেট অংশুমান ঘোষ একদৃষ্টে চেয়ে আছে মানুষ অনিন্দ্য সেনের দিকে। অনিন্দ্য সেন এ সব কি বলছে? তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আদালতের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা তো কখনও ঘটেনি।

শুধু অংশুমান ঘোষই নয়, প্লেনটিফের এ্যাডভোকেট সুনীল সান্যালও হতবাক হয়ে গেছে জজ-সাহেবের কাণ্ড দেখে।

সামনে দর্শকদের আসনে চরণ দাস বাবাজীও একদৃষ্টে চেয়ে আছে জজ সাহেবের মুখের দিকে। অনিন্দ্য সেন আজ এ সব কি বলছেন? এর আগে চরণ দাস বাবাজী কখনও আদালতে আসেনি। আদালতে কি এই সব ঘটনা ঘটে নাকি?

আর সবার সামনে বুক ফুলিয়ে বসে আছে ডাক্তার পরমার্থ বোস। 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোম'এর মালিক।

জজের চেয়ারে বসে মানুষ অনিন্দ্য সেন তখনও একটানা করে চলেছেন তাঁর স্বীকারোক্তি। ...এই প্রসঙ্গে আমি মঁসিয়ে ল্যাভয়জিঁয়ারের নাম করবো। ল্যাভয়জিঁয়ারের নাম শুনেছেন আপনারা? ফরাসী দেশের বিখ্যাত কেমিস্ট্ ল্যাভয়জিঁয়ার?

সেদিনও প্রতিদিনকার মতন চরণ দাস বাবাজী সকাল বেলা বাড়িতে এসে নিয়মমত নামগান আরম্ভ করে দিয়েছে ঃ

কার ভাবে নদেয় এসে, কাঙাল বেশে...
হরি হয়ে বলছো হরি
কার ভাবে নদেয় এসে, কাঙাল বেশে...
হরি হয়ে বলছো হরি
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব
তাও কিছু বুঝতে নারি...

হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে চাঁপা এসে বললে—ও-গান আজ নয় গো, আজকে সেই গানটা গাও—

—কোন্ গানটা মা-জননী?

চাঁপা বললে—ওরে পা পিছলে গেলে...

তখন চরণদাস বাবাজী অন্য আর একটা গান গাইতে লাগলো ঃ

ওরে পা পিছলে গেলে ওঠা হবে দায়
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়?
ভবনদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়?
কোথাও গড়ে হাঁটু পানি কোথাও হাতী তলিয়ে যায়—

কালিদাসী তখন রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত ছিল। সুভদ্রা চাল-ডাল আর পান সুপুরি নিয়ে নিজেই এসে হাজির হলো।

চরণ দাস বাবাজী নিজের থলিটা বাড়িয়ে দিতেই সুভদ্রা তার ভেতরে সিধেটা ঢেলে দিলে।

চরণদাস বাবাজী বললে—আপনি কেন আবার কষ্ট করতে এলেন মা-মণি। মা-জননীর হাত দিয়ে পাঠালেই পারতেন—

সুভদ্রা বললে—আপনি আপনার মা-জননীকে একটু বকুনি দিয়ে যান তো বাবাজী! আপনার মা-জননী আমার বউমার সঙ্গে সারাদিন কেবল ঝগড়া করে—

—কেন, ঝগড়া করে কেন?

—কেন ঝগড়া করে তা আপনার মা-জননীকেই জিজ্ঞেস করুন না—

চরণদাস বাবাজী চাঁপার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন মা-জননী, বউমা-ঠাকুরুণের সঙ্গে ঝগড়া করো কেন? কারোর সঙ্গেই ঝগড়া করতে নেই, বুঝলে?

চাঁপা বললে—আমি যদি অনিন্দ্যদার সঙ্গে কথা বলি তো বউদিদিমণি রাগ করে কেন?

চরণদাস বাবাজী বললে—মানুষ কি কারোর ওপর শুধু রাগ করে মা-জননী? নিশ্চয় তুমি কিছু অন্যায় করো। তুমি অন্যায় করলে বউদিদিমণি রাগ তো করবেনই —বউদিদিমণির তো কোনও দোষ নেই—

সত্যিই কল্যাণীর কোনও দোষ ছিল না। নতুন বিয়ে হওয়ার পর কল্যাণী শ্বশুরবাড়িতে এসে এইটেই লক্ষ্য করলে যে তার স্বামী নিজের কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না! এত অল্প বয়েসে অনিন্দ্য যে নিজের বৃত্তিতে এত উন্নতি করেছে তা কেবল তার কাজের একাগ্রতার জন্যেই।

একদিন কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—তুমি এত রাত পর্যন্ত কি করো? এত তোমার কিসের কাজ?

অনিন্দ্য সন্ধ্যের পর থেকে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছে। ব্রীফ্ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করেছে। পরের দিনের কর্তব্য-কাজ সম্বন্ধে বিবেচনা করে ডায়েরী বইতে নোট নিয়েছে। তার ওপর কোর্টে সমস্ত দিনের পরিশ্রমও গেছে খুব। কল্যাণীর কথার জবাবে বললে—কি কাজ করি তা তুমি দেখতে পাও না?

কল্যাণী বললে—তা তো দেখতে পাই। কিন্তু এখন রাত ক'টা তা জানো?

অনিন্দ্য বললে—জানি। রাত একটা—

কল্যাণী বললে—সকাল থেকে তো তুমি নিজের ক্লায়েন্ট্ আর ব্রীফ নিয়ে থাকো, আর রাত এই একটার আগে কোনও দিনই তোমার ছুটি হয় না।

অনিন্দ্য বললে—যেদিন থেকে আমি কোর্টে বেরোচ্ছি, সেই দিন থেকেই তো আমি এইরকম দেরি করে শুতে আসি—

কল্যাণী বললে—আগেকার কথা ছেড়ে দাও। আগে তুমি যা করতে তা করতে, কিন্তু এখন তো তুমি বিয়ে করেছ।

অনিন্দ্য বললে—বিয়ে করেছি বলে কি চিরকালের অভ্যেসটা বদলাতে হবে?

কল্যাণী বললে—বিয়ে করবার পরে তো সকলেরই চিরকালের অভ্যাস বদলে যায়—

অনিন্দ্য বললে—কে বললে সে-কথা? আমি তো বিয়ে করবার পর কারো অভ্যেস কখনও বদলাতে দেখিনি—

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমি বদলাতে দেখেছি—

অনিন্দ্য বললে—তাহলে বুঝতে হবে আমার দেখবার চোখ নেই—

কল্যাণী বললে—না, তা নয়। আসল কথা হলো তোমার মক্কেল ছাড়া আর কোন দিকে তোমার নজর দেওয়ার সময়ও নেই, আর নজর দেওয়ার ইচ্ছেও নেই—

অনিন্দ্য বললে—একদিক থেকে তোমার কথাটা হয়ত সত্যি। কারণ আমাদের যা প্রফেসান তাতে সমস্ত জীবনটাই আমাদের মক্কেলদের জন্যে ডেডিকেট করতে হয়—

—মক্কেলদের জন্যেই যদি জীবনটা ডেডিকেট করে দাও তাহলে বিয়ে করতে গেলে কেন?

প্রশ্নটা বড় জটিল।

অনিন্দ্য বললে—এখন রাত একটা বেজে গেছে, আজ এখনই কি তোমার প্রশ্নের উত্তর চাও? তাহলে কিন্তু কাল দিনের বেলায় কোর্টে গিয়ে আমি কিছু কাজ করতে পারবো না—তাতে মক্কেলদের খুব ক্ষতি হবে—

কল্যাণী উত্তরটা সোজাসুজি না দিয়ে নিজেই আর একটা সওয়াল করলে।

বললে—মক্কেলদের ক্ষতিটাই তোমার কাছে বড়ো হলো, না?

অনিন্দ্য বললে—নিশ্চয়ই, আমি একজন এ্যাডভোকেট, আমার প্রধান কাজ হলো ক্লায়েন্টদের উপকার করা—

—ক্লায়েন্টদের উপকার করা, না তোমার নিজের উপকার করা?

অনিন্দ্য বললে—জানি না কথাটা তুমি বিশ্বাস করবে কি না। সব এ্যাডভোকেট মক্কেলদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবে কি না তা জানি না, কিন্তু আমি এ্যাড্ভোকেট হয়েছি মানুষের উপকার করবার জন্যে। দেশে মানুষরা এত অত্যাচারিত এত এক্সপ্লয়েটেড যে তাদের কথা ভাবলেই আমি আর থাকতে পারি না—

—সে তো তুমি টাকার জন্যে করো!

অনিন্দ্য বললে—এ কথা তোমাকে কে বললে? টাকার জন্যে যদি করতুম তাহলে আজকে আমার টাকার শেষ থাকতো না। আমার জামা-কাপড় দেখে বুঝতে পারো না যে আমি মোটেই বড়ো লোক বলতে যা বোঝায় তা নই?

কল্যাণী বললে—কারো জামা-কাপড় দেখে কি বোঝা যায় যে সে বড়োলোক না গরিব লোক ?

অনিন্দ্য বললে—আমাদের ইণ্ডিয়াতে তো মানুষরা তাই দেখেই সব কিছু বিচার করে থাকে।

কল্যাণী বললে—তাহলে যারা কৃপণ লোক তাদের বেলায় কি করবে ?

অনিন্দ্য বললে—তাদের সংখ্যা এত কম যে তাদের নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। বেশির ভাগ লোকই তো এখানে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে ব্যস্ত। তার প্রতিবাদ হিসেবেই তো আমি সাদা-সিধে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বেড়াই—

কল্যাণী বললে—সেইটেই যদি তোমার মত হয় তো তাহলে বিয়েটা করলে কেন ?

অনিন্দ্য বললে—বিয়ের সঙ্গে বিলাসিতার কি সম্পর্ক ? বিয়ে করলেই কি যে-কোনও রকমে হোক লোককে জানাতে হবে যে আমার অনেক টাকা-কড়ি আছে ?

কল্যাণী বললে—তোমার দরকার না হোক, আমার দরকার আছে। আমি টাকা-কড়ি চাই—

—সে কি ? তুমি সত্যি বলছো ?

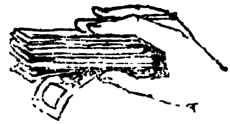
কল্যাণী বললে—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আমার টাকা-কড়ি চাই—অনেক টাকা চাই আমার—

—শুধু টাকাই চাও ? আর কিছু চাও না ?

কল্যাণী বললে—না।

উত্তরটা শুনে অনিন্দ্য কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন অনেক লোক আছে যারা জীবনে শুধু টাকাই চায় আর কিছু চায় না। কিন্তু মুখে তারা সে-কথা কখনও কারোর কাছেই প্রকাশ করে না। কিন্তু কল্যাণী এ কি বলছে ? এইটেই কি তার মনের কথা ?

অথচ মাস্টার সাহেব মোহম্মদ আশিফ তাকে যে 'MAN' নামের বইটা উপহার দিয়েছিলেন তাতে তো সে-কথা লেখা ছিল না। বরং এই কথাই লেখা ছিল যে ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে যে-মানুষরা টাকাকে তিলাঞ্জলি দিতে পেরেছিল সেই মানুষদেরই মানুষরা মহাপুরুষ আখ্যা দিয়ে স্মরণীয় করে রেখেছে। কিন্তু কল্যাণী কি সেকথা জানে না ?



অনিন্দ্য সেনের বিবাহিত-জীবনের প্রথম দিকের এই অভিজ্ঞতা তার স্মৃতিতে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। তার জানাশোনা অন্য মানুষদের কারো জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না তার সন্ধান সে কখনও পায়নি।

তার জীবনে অংশুমান ঘোষ একেবারে গোড়ার দিকের বন্ধু। বন্ধুও বটে, আবার তার সঙ্গী, সাথী বা জুনিয়ারও বটে।

অংশুমান যে কেন তার জীবনে এসে উদয় হয়েছিল তা তার জানা নেই। অংশুমান না এলে বোধহয় তার জীবনের স্রোত অন্য খাতেই বইতো। সংসারে এমন এক-একজন মানুষ থাকে যাদের জন্ম না হলে আমাদের পৃথিবী, আমাদের সংসার হয়তো আরো সুন্দর আরো সুখের হতো।

অনিন্দ্য এই পৃথিবীটাকে চিনতেই পারতো না যদি তার জীবনে অংশুমানের আবির্ভাব না হতো।

অংশুমানই বলতো—মিস্টার সেন, এবার আপনি ফিস্‌টা একটু বাড়িয়ে দিন—

হঠাৎ এই কথাটা শুনে অনিন্দ্য বলতো—কেন? হঠাৎ আমার ফিস্‌ বাড়াবো কেন?

অংশুমান বলতো—সব এ্যাডভোকেটই তো ফিস বাড়িয়ে দিচ্ছে—

—সবাই বাড়াচ্ছে বলে আমিও বাড়াবো?

অংশুমান বলতো—কেন বাড়াবেন না আপনি? বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়ছে আর আপনি আপনার ফিস্‌ বাড়াবেন না? পেট্রলের দাম কি হারে বাড়ছে বলুন তো? চাল, চিনি, আলু, তেল, কোন্‌ জিনিসটার দাম আগেকার মত আছে বলুন?

অনিন্দ্য বলতো—কিন্তু আমাকে তো মক্কেলদের আর্থিক অবস্থার কথাও ভাবতে হবে। তাদের সকলের তো আর ইন্‌কাম বাড়ছে না। আমার অনেক ক্লায়েন্ট তো আবার খুবই গরিব। তারপর একটু থেমে অনিন্দ্য আবার বলতো—আর তা ছাড়া আমার তো এক রকম করে চলেই যাচ্ছে—

অংশুমান বলতো—সংসার চলে যাওয়াটাই কি বড়ো কথা হলো? সংসার তো সকলেরই চলে যায়। কার আর সংসার অচল হয়ে আছে, বলুন না? যদি সকলের মাথার ওপরেই না-উঠতে পারলুম তো বেঁচে থেকে লাভটা কি?

অনিন্দ্য সেন বলতো—বেশী টাকা উপায় করে সকলের মাথার ওপর ওঠাটা কি খুব ভালো জিনিস ?

—কেন নয় ?

অংশুমান বলতো—কেন নয় শুনি ? পৃথিবীতে যার অনেক টাকা আছে তাকেই তো লোকে শ্রদ্ধা করে, মান্য করে, ভক্তি করে।

অনিন্দ্য বলতো—যে সমাজ টাকাওয়ালা মানুষকে শ্রদ্ধা করে, মান্য করে, ভক্তি করে, সে মানুষকেও ধিক আর সেই মানুষের সমাজকেও ধিক।

অংশুমান এ কথার জবাবে আর কিছু বলতে পারতো না।

অনিন্দ্য বুঝতে পারতো কথাটা অংশুমানের মনের মত হয়নি।

অনিন্দ্য অংশুমানের দিকে চেয়ে বলতো—কথাটা তোমার শুনতে ভালো লাগেনি, বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার জুনিয়ার হিসেবে তুমি কাজ করছো বলে তোমার ফিস্ বাড়াতে যে আপত্তি করবো, তা নয়। তুমি আমার জুনিয়ার হিসেবে কত পাও ?

অংশুমান বলতো—ব্রীফ পিছু কুড়ি টাকা—

অনিন্দ্য বলতো—ঠিক আছে, এবার থেকে আমার সব ক্লায়েন্টকে বলে দেব তারা যেন কুড়ি টাকার বদলে তোমার ফিস্ বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে দেয়—

অংশুমান এ-কথার কোনও প্রতিবাদ করেনি। আর তার পর থেকে ক্লায়েন্টরা বরাবর তাকে চল্লিশ টাকা হারেই ফিস দিয়ে গিয়েছিল।

অনিন্দ্য বুঝতে পেরেছিল যে টাকার ব্যাপারে কল্যাণীর সঙ্গে অংশুমানের মনোভাব একই রকম। কল্যাণীও টাকাকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু হিসেবে মনে করে, আর অংশুমানও তাই। একদিক থেকে দুজনেই অভিন্ন। কিন্তু তফাৎ শুধু এই যে একজন হলো নারী আর অন্যজন পুরুষ। অর্থাৎ টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

একজন এ্যাড্ভোকেটকে সমাজের মানুষ শুধু জানে আইনের যন্ত্র হিসেবে। মহামান্য আদালতের যন্ত্র ছাড়া এ্যাড্ভোকেট আর কিছুই নয়। তার কাছে পরিবার কিছু নয়, বাবা কিছু নয়, মা-ও কিছু নয়। এমন কি স্ত্রী পুত্র কন্যা, তারাও তার কাছে আর কিছু নয়। সারা জীবন শুধু আইন আর আইন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আইন আর রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কেবল আইন।

পেছন দিকে ফিরে তাকালেই মনে পড়ে কেবল আইনের কথা। আইন তৈরি হয়েছে অত্যাচারিত মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে, কিন্তু মানুষই আবার অত্যাচারিত হচ্ছে সেই আইনেরই অপব্যাখ্যা করে। অনিন্দ্য সেই অত্যাচারিত মানুষের পক্ষ নিয়েই সমস্ত জীবন লড়াই করে এসেছে। তেমন মানুষের কাছ থেকে অনিন্দ্য অনেক সময়ে কোনও পারিশ্রমিকও নেয়নি। সেই সব ব্যাপারেও বিরোধ বেধেছে কল্যাণীর সঙ্গে।

কল্যাণী বলতো—মক্কেলের কাছ থেকে টাকা না-নেওয়াও তোমার এক-রকমের

স্বার্থপরতা, টাকা না-নিয়ে তুমি মক্কেলদের চোখে মহাপুরুষ বলে নাম কিনতে চাও—

অনিন্দ্য বলতো—তুমি যদি তা মনে করে খুশী হতে চাও, তাহলে আমি তাই-ই—

কল্যাণী বলতো—গরিব মক্কেলদের কাছ থেকে টাকা না নিয়ে তুমি আমাকেও ঠকাচ্ছো—

—তার মানে ?

কল্যাণী বলতো—আমি তোমার বিয়ে করা বউ, আমাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখাও তো তোমার একটা কর্তব্য !

—তোমাকে কি আমি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিনি ? তোমার কি খাওয়া-পরা-থাকার দিক থেকে কখনও কোনও কষ্ট দিয়েছি আমি ? বলো, আমার কথার জবাব দাও—

কল্যাণী বলতো—শুধু খাওয়া-পরা-থাকার কথাটাই কি সব ? শুধু খেয়ে-পরে থেকেই কি মানুষ সুখী হয় ? মানুষের আর কিছু জিনিসের কি দরকার হয় না ?

—বলো আর কিছু জিনিস বলতে কোন্‌টা বোঝাতে চাইছো তুমি ?

কল্যাণী বলতো—যে বাড়িতে আমি আছি এ-বাড়িতে কি মানুষ থাকতে পারে ? এ-বাড়িতে কি হাওয়া ঢোকে ? এ-বাড়িতে কি রোদ ঢোকে ? এ-বাড়ির জানালা দিয়ে কি আকাশ দেখা যায় ? এই যে আমি যা পরে আছি, এই শাড়ি পরে কি ভদ্রলোকের মেয়েরা বাইরের লোকের সামনে বেরোতে পারে ?

অনিন্দ্যর কানে কথাগুলো বোমার মত ফেটে উঠলো। কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোলো না।

কল্যাণীই প্রথমে কথা বললে। বললে—কই, আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে ?

অনিন্দ্য বললে—তুমি আগে তোমার সব কথা বলে নাও। বলো আমার বিরুদ্ধে তোমার আর কি কি অভিযোগ ?

কল্যাণী বললে—ক'টা অভিযোগের কথা বলবো বলো ? তুমি তো সারাদিন কোর্টে থাকো, মক্কেলদের সঙ্গে তোমার সময় এক রকম করে কেটে যায়। কিন্তু আমি ? আমি এই অন্ধকার ঘুপ্‌সি ঘরের মধ্যে সারাদিন কি করে কাটাই তা নিয়ে তুমি কোনও দিন কখনও ভেবেছ ?

অনিন্দ্য বললে—ও, এই কথা ?

কল্যাণী কথাটা লুফে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, এই কথা। তোমার কাছে এটা সামান্য কথা হতে পারে, কিন্তু তোমাকে আমার মতো এই ঘরে সমস্ত দিন বন্দী হয়ে থাকতে হলে বুঝতে আমার কি কষ্ট।

তারপর একটু থেমে কল্যাণী আবার বললে—তুমি হয়ত বলবে লাইব্রেরীর মেম্বার হই না কেন ? লাইব্রেরী থেকে বই এনে মুখে নিয়েই তো সময় কাটাতে পারি। কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে ? তুমিই বলো না, এত বড় কলকাতা শহর, এখানে এত

মানুষ, তাদের সঙ্গে মিশতে, তাদের দেখতে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করাটাও কি অন্যায় ?

অনিন্দ্য বললে—তাই বলো, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তা এতই যদি নিঃসঙ্গ মনে হয় তোমার, তাহলে চাঁপার সঙ্গেও তো মাঝে মাঝে গল্প করতে পারো। কিংবা চাঁপার সঙ্গে কোনও সিনেমাও তো দেখতে পারো। আমি তো তোমাকে সিনেমা দেখতে কখনও বারণ করিনি—

—কি বললে ? চাঁপার সঙ্গে আমি গল্প করবো ? চাঁপাকে সঙ্গে নিয়ে আমি সিনেমায় যাবো ?

অনিন্দ্য বললে—কেন, তাতে দোষ কি ?

কল্যাণী বললে—তুমি বলছো কি ? আমি ঝি-এর সঙ্গে কথা বলবো ? আমি ঝি-এর সঙ্গে সিনেমায় যাবো ?

অনিন্দ্য বললে—ঝি বলে কি সে মানুষ নয় ? জানো, কত বছর ধরে ও আমাদের বাড়িতে আছে। ওর মা ছিল বলেই এখন তুমি আমরা সবাই খেতে পাচ্ছি ? ও আসার আগে আমাদের বাড়িতে অর্জুন ছিল, সে-ও আমাদের বাড়িতে থাকতে থাকতে আমাদের নিজেদের লোক হয়ে গিয়েছিল। চাঁপাকে বা চাঁপার মা'কে আমরা কখনও পর ভাবি না।

কল্যাণী বললে—তোমরা পর না ভাবতে পারো, কিন্তু আমার কাছে ওরা পর··· আর চিরকাল ওরা আমার পরই থাকবে !

অনিন্দ্য বললে—তোমার কাছে পর থাকতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে তা নয়। চাঁপা আর চাঁপার মা আমাদের বাড়ির লোক হয়ে গেছে, আর বরাবর আমাদের বাড়ির লোকই হয়ে থাকবে—

কল্যাণী বললে—তা তো থাকবেই, যেদিন থেকে এসেছি সেই দিন থেকেই আমি তা বুঝে গিয়েছি—

—কি বুঝে গিয়েছ তুমি ?

—কি বুঝেছি তা বললে তুমি ক্ষেপে যাবে।

—যা বুঝেছ তা স্পষ্ট করে বলো। ও-রকম হেঁয়ালি কথা আমার ভালো লাগে না। ছোটবেলা থেকে আমি ওদের দেখে আসছি, ছোটবেলা থেকে ও আমার কাছে আবদার করে আসছে। কতবার ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় আমসত্ত্ব কিনে আনবার জন্য বায়না ধরেছে, কতবার লজেন্স কিনে আনবার জন্য আবদার করেছে···

কল্যাণী থামিয়ে দিয়ে অনিন্দ্যকে বললে—থামো থামো, ওর গুণগান আর অত ব্যাখ্যা করতে হবে না—

—কেন থামবো ? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি যে তোমার কথায় আমি থামবো ? যা সত্যি তাই-ই বলছি আমি—

কল্যাণী বললে—থাক থাক, আর বলতে হবে না। আমিও কানা নই, আমারও চোখ আছে, আমারও মগজে বুদ্ধি-সুদ্ধি বলে একটা পদার্থ আছে—

অনিন্দ্য বললে—কি বলতে চাও, সোজা করে বলো, অত হেঁয়ালি করে বলতে হবে না—

কল্যাণী বললে—আমি বলতে চাই ঝি ঝি-এর মতো থাকবে, তার মধ্যে অত ঠাট-ঠমক্ করবে কেন ?

—ঠাট-ঠমক্…?

কল্যাণী বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বাংলা ভাষাটাও বোঝ না ?

অনিন্দ্য যেন এক মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিলে। বললে—ছিঃ, তুমি এত নোংরা ?

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। তার চেম্বারে তখন ক্লায়েন্ট্ এসে হাজির হতে আরম্ভ করেছে। যেমন ভাবে সে ছিল তেমনি ভাবেই সে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।



নিজের কথা বলতে বলতে অনিন্দ্য সেন একটু থামলেন। হয়ত এক পলকের জন্যে দম নিলেন। চেম্বারের চার দেয়ালের মধ্যে উগ্র কৌতূহল। মাঝে মাঝে সবাই ডিফেন্ডেন্ট্ পক্ষের এ্যাড্ভোকেট অংশুমান ঘোষের দিকে চেয়ে দেখছে। অংশুমান ঘোষকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অনিন্দ্য সেনের কথায় যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু সেই বিব্রত হওয়ার ভাবটা তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় লুকোবার চেষ্টা করে চলেছেন।

অনিন্দ্য সেন বলে চলেছেন—সেই তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে, যে-পৃথিবীতে আমি জন্মেছি সেই পৃথিবীটাই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু। আমার বাবাও চেয়েছিলেন আমি জীবনে একজন 'মানুষ' হই আর না-হই, আমি যেন অনেক টাকা উপার্জন করি। সেই জন্যেই তিনি তাঁর অফিসে মাসে আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরিটা নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন।

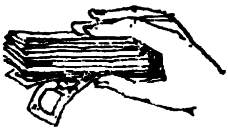
আর মা ?

আমার মা কোনও দিন কোনও ব্যাপারেই মাথা ঘামাতো না। ছোটবেলায় যতদিন অর্জুন আমাদের বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে ছিল ততদিন সব কাজের ভার তার

ওপরেই ছিল। সে চলে যাবার পর কিছুদিন আমি নিজেই সে-কাজগুলো করতাম। আমি এ্যাড্‌ভোকেট হওয়ার পর বাবা রিটায়ার করলেন। তখন থেকে সে-সব কাজ আর আমাকে করতে হলো না, সে-কাজগুলোর ভার পড়লো বাবার ওপর। আর তাঁকে সাহায্য করতো কালিদাসী। আর তার বাপমরা মেয়ে চাঁপা।

আর সেই চাঁপাই যে আমার জীবনে একদিন চরম দুর্যোগ হয়ে ঘনিয়ে আসবে তা আমি সেদিন কল্পনাই করতে পারিনি। সেই চাঁপাকে নিয়েই এখন মামলা হচ্ছে আমার আদালতে।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। তার আগে বলে নিই আমার বাবার কথা···



একদিন সুভদ্রা দিবানাথবাবুকে বললে—এ তুমি কেমন মেয়েকে বাড়িতে বউ করে আনলে গো?

দিবানাথবাবু তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বসে আছেন। সময় আর তাঁর কাটে না। একে অফিস নেই, তার ওপর মাসকাবারি মাইনের নগদ টাকা আমদানিও বন্ধ। চিরকাল চাকরি করতে গিয়ে পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করবার অবসর পাননি। তাই তখন তাদের সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা করবার আর প্রশ্নই ওঠে না। তাই তিনি তখনও আগেকার মতো নিঃসঙ্গই রয়ে গেলেন। কারো সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেলেও তাই তাতে তত আমল দিতো না তারা।

শুধু 'কেমন আছেন' 'ভালো আছি'—এই সব বাঁধা-বুলির পর কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোয় না। তখন তার কাছ থেকে সরে আসা ছাড়া দিবানাথবাবুর আর কোনও উপায় থাকে না।

কোনও দিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে খানিকটা বেড়িয়ে আসেন। চিরকালের অঞ্চলটাও যেন তাঁর চোখে নতুন ঠেকে। নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বসে যে পাড়ার লোকদের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব বা তাদের একটু আপ্যায়ন করবেন তারও উপায় নেই। যতদিন অনিন্দ্যর মাস্টারসাহেব তাকে পড়াতে আসতেন, ততদিন ওই ঘরটাই ছিল ছেলের পড়ার ঘর। ও-ঘরটা তারপর হয়েছে ছেলের চেম্বার। সকালে আর বিশেষ করে সন্ধ্যের পর থেকে সে-ঘরে মক্কেলদের ভিড় জমে। তখন দিবানাথবাবুকে ভেতরের

ঘরেই আশ্রয় নিতে হয়। এই সব কারণে দিবানাথবাবুর কাছে তাঁর নিজের জীবনটা যেন কেমন ছন্নছাড়ার মত লাগে।

বিকেল বেলা খানিকটা বাইরের রাস্তায় ঘুরে আসতেই স্ত্রীর মুখ থেকে ওই কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—কি বললে তুমি ?

সুভদ্রা বললে—বলছিলুম তুমি এ কেমন মেয়েকে বাড়িতে বউ করে আনলে ?

দিবানাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেন, তুমি ও-কথা বলছো কেন ?

সুভদ্রা বললে—কেবল খোকার সঙ্গে ঝগড়া করে—

—ঝগড়া করে ? কে ? বউমা ?

—হ্যাঁ—

—কি নিয়ে ঝগড়া করে ?

সুভদ্রা বললে—অত কি স্পষ্ট শুনতে পাই আমি ? সামান্য যেটুকু কানে আসে তাই শুনেই বলছি—

—কি, বলেটা কি ?

—বলে নতুন একটা বাড়ি করতে। এ-বাড়িতে নাকি হাওয়া ঢোকে না, রোদ ঢোকে না, বন্ধ খাঁচার মধ্যে থাকতে দম আটকে আসে—

—তাই নাকি ? বউমা বলে এই সব কথা ?

তারপর দিবানাথবাবু একটু থেমে আবার বল্লেন—তা বউমার বাপের বাড়িতে কত রোদ কত হাওয়া ঢোকে ? সেও তো গলির মধ্যে খাঁচার মত দম-বন্ধ হওয়ার মত বাড়ি। সে-বাড়িও তো আমি দেখেছি। আমি যে তা দেখিনি, তা তো নয়…

সুভদ্রা বললে—কে জানে এ-বাড়ির কি দোষ দেখলে বউমা। আমার তো এই বাড়িতেই জীবন কেটে গেল।

দিবানাথবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—আর কি কি বললে ?

—সে আরো অনেক কথা।

দিবানাথবাবুর কৌতুহল আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন—বলো না কি কথা ?

সুভদ্রা বললে—ওই টাকা-কড়ি নিয়েই কথা হচ্ছিল—

—টাকা-কড়ি নিয়ে কি কথা ?

সুভদ্রা বললে—বলছিল অনিন্দ্যকে আরো টাকা উপায় করতে।

—আরো টাকা উপায় করতে ? তার মানে ?

সুভদ্রা বললে—বলছিল খোকা ওকালতি করে যে-টাকা উপায় করে তা নাকি খুবই কম। আরো বেশী টাকা উপায় করলে নাকি আরো বেশী আরামে থাকা যেত। বাড়িতে টি. ভি. কিনতো, জল ঠাণ্ডা করবার কল কিনতো, ঘর ঠাণ্ডা

করবার যন্তর কিনতো, লোডশেডিং হয়ে গেলে আলো জ্বালাবার ব্যাটারি বাতি কিনতো…

দিবানাথবাবু চিন্তায় পড়লেন—নতুন বউ হয়ে এসেই এই বায়না ধরেছে খোকার কাছে? এ তো ভালো কথা নয়। বউমার ভাই-এর বাড়িতে ক'টা টি. ভি. আছে, ক'টা ফ্রিজ আছে আর ক'টাই বা জেনারেটার আছে…

সুভদ্রা বললে—তা জানিনে বাপু, যা শুনতে পেলুম তাই তোমাকে বললুম। তুমি যেন আবার খোকাকে এ-সব কথা বলতে যেও না।

দিবানাথবাবু মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বড় কষ্ট পেলেন। অনেক দিন থেকেই তিনি ছেলের জন্য একটা পাত্রীর খোঁজ করছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি ঠিক মেয়ে আনবেন করেছিলেন যে বড়লোকের বাড়ি থেকে কিছুতেই মেয়ে আনবেন না। এমন এক বাড়ি থেকে মেয়ে অনবেন যাদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য কম, যাদের আয়ের অঙ্ক ব্যয়ের অঙ্ককে ছাড়িয়ে যায় না, আর যারা দরিদ্র হয়েও আভিজাত্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে বাইরের জগৎকে প্রবঞ্চনা করে না।

কিন্তু সে রকম পরিবার কোথায় পাওয়া যাবে?

তা খুঁজলে কি-ই বা না পাওয়া যায়!

তাই সে-রকম পরিবার যখন পাওয়া গেল তখন সেই পরিবারের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে পাকা কথা তিনি দিয়ে ফেললেন।

কিন্তু তখন কে জানতো যে সেই পরিবারের মেয়ে এ বাড়িতে এসে হঠাৎ এত উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে উঠবে। বাবা নেই, মা নেই, শুধু গরিব ভাই গৃহকর্তা। তবু তার এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন?

তিনি ভেবে দেখলেন হয়ত এইটেই স্বাভাবিক। গরিব দাদার সংসারে থেকে মনের যত অভিলাষকে অবদমিত রেখে রেখে স্বামীর সংসারে এসে যদি তা প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করতে চায় তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই এখন তার সব চাই। বড় রাস্তার ধারে বাড়ি চাই, টি. ভি. চাই, রেকর্ড চেঞ্জার চাই, রেফ্রিজারেটর চাই। লোড-শেডিং-এর সময়ে জেনারেটার চাই। পৃথিবীর বিজ্ঞান আমাদের আরাম দেবার জন্যে এ যাবৎ যা-যা-কিছু আবিষ্কার করেছে, তার সবই চাই তার।

অনিন্দ্যর সঙ্গে দিবানাথবাবুর এখন আর তেমন আগেকার মত দেখাও হয় না, তেমন আর কথাও হয় না। অনিন্দ্যরই বা তখন আর অত সময় কোথায়? তখন সে কেবল ব্যস্ত মক্কেল আর মক্কেল নিয়ে। বাড়িতে যতটুকু থাকে ততক্ষণ তারাই অনিন্দ্যকে ঘিরে থাকে। অনিন্দ্যই তাদের মুক্তিদাতা, অনিন্দ্যই তাদের ত্রাণকর্তা।

কিন্তু একদিন অনিন্দ্য তখন কোন্ একটা বন্ধুর ছেলের বিয়েতে হাজিরা দিতে গিয়েছে। তখনও বাড়িতে আসেনি সে।

তবে অংশুমান এসেছে। দিবানাথবাবু রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে বাইরের ঘরের দিকে চেয়ে দেখলেন ছেলে নেই, কেবল তার জুনিয়ার বসে আছে।

এমনিতে দিবানাথবাবু ছেলের জুনিয়ারের সঙ্গে বেশী কিছু কথা বলেন না। কিন্তু সেদিন কি হলো, তিনি নিজে যেচেই কথা বললেন।

অংশুমানই নিজে থেকে সিনিয়ারের বাবাকে নমস্কার করলে।

দিবানাথবাবুও হাত তুলে নমস্কার করলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—খোকা কোথায়? এখনও আসেনি?

অংশুমান বললে—তিনি একটা বিয়ে-বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে গেছেন, আসতে একটু দেরি হবে—

অন্যদিন হলে দিবানাথবাবু ওই কথা ক'টা বলেই ভেতরে চলে আসতেন। কিন্তু সেদিন তা করলেন না। একটু দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—আপনাদের কাজ-কারবার কেমন চলছে?

অংশুমান বললে—ভালোই ··

ওইটুকু উত্তর দিয়েই অংশুমান থেমে গিয়েছিল। ভেবেছিল আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

কিন্তু দিবানাথবাবু এমন একটা কাজ করে বসলেন যা আগে কখনও করেন নি।

জিজ্ঞেস করলেন—আজকাল আপনাদের মামলা-টামলা সব কেমন চলছে?

অংশুমান বললে—ভালোই চলছে—

দিবানাথবাবু বললেন—সে তো ভালো চলবেই। আমি তা বলছি না। খোকার গাড়িটা তো আজকাল খারাপ হয়ে গেছে, কারখানায় গেছে। কিন্তু গাড়িটা বদলালেই তো ভালো হয়—

অংশুমান বললে—বদলালে তো ভালোই হয়, কিন্তু আজকাল গাড়ির যা দাম তাতে গাড়ি বদলানোও তো অনেক খরচের ব্যাপার—

দিবানাথবাবু বললেন—আমিও তো তাই বলি। কোর্টে মামলাতো বাড়ছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে এ্যাড্‌ভোকেটদের আয়ও তো বাড়া উচিত সেই অনুপাতে—

অংশুমান বললে—যে অনুপাতে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে সে অনুপাতে তো এ্যাড্‌ভোকেটদের আয় বাড়ছে না—

দিবানাথবাবু বললেন—কেন বাড়ছে না?

অংশুমান বললে—অনেক ল'ইয়ারেরই রেট্ বেড়ে গেছে, কিন্তু অনিন্দ্যবাবু যে কেন তাঁর ফিস্ বাড়াচ্ছেন না, তা বলতে পারছি না।

দিবানাথবাবু বললেন—সত্যিই তো, খোকা কেন ফিস্ বাড়াচ্ছে না?

অংশুমান বললে—ওই কথা বলে কে? আমি তো একদিন অনিন্দ্যবাবুকে সেই কথাই বলেছিলুম।

—আপনি বলেছিলেন ?

—হ্যাঁ, আমি বলেছিলুম বই কি। কেন বলবো না ? আমারও তো সংসারের বোঝা বইতে হয়। আমি আগে ওঁর জুনিয়ার হিসেবে কেস পিছু কুড়ি টাকা নিতুম, আমি অনেক করে বলার ফলে আমি আমার রেট কুড়ি টাকা থেকে বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে নিয়েছি—

দিবানাথবাবু বললেন—আর খোকা ?

—উনি আগেও ষাট টাকা করে নিতেন, এখনও ষাট টাকা করে নেন।

—কেন ? খোকা তার রেট বাড়ায় নি কেন ?

অংশুমান বললে—আমি অনেক বার বলেছি বাড়াতে। কিন্তু উনি বলেন জিনিস-পত্রের দাম যে-হারে বেড়ে গেছে, তাতে বাঁধা-মাইনে পাওয়া লোকদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তার ওপরে যদি আমরাও আমাদের রেট বাড়িয়ে দিই তাহলে তাদের খুব কষ্ট হবে—

দিবানাথবাবু বললেন—মক্কেলদের কষ্ট হবে বলে এ্যাডভোকেটরা তাদের ফিনু বাড়াবে না ? এটা কি একটা বুদ্ধিমানের মত কথা হলো ?

অংশুমান বললে—এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলবো বলুন ? আপনিই একমাত্র ওঁকে এ-ব্যাপারে বলতে পারেন···

দিবানাথবাবু চমকে উঠলেন, বললেন—আমি ?

—হ্যাঁ, আমার বলার চেয়ে আপনার বলাই ভালো—

দিবানাথবাবু বললেন—আমার সঙ্গে তো বলতে গেলে প্রায় দিন দেখাই হয় না। খোকা তো সমস্ত দিন মক্কেলের কাগজ-পত্র দেখতেই ব্যস্ত। তার সঙ্গে কখন কথা বলবো ?

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—জানেন, আমি চাইনি ও ওকালতি লাইনে আসুক। আমার ইচ্ছে ছিল ও আমার মত চাকরি করুক। চাকরিতে অনেক রকমের সুবিধে। অনেক ছুটি-ছাটা আছে। প্রথমেই তো খোকাকে আড়াই হাজার টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল আমার বড় সাহেব। তা তো ও নিলে না—

অংশুমান এ-কথার কি আর জবাব দেবে, তাই সে চুপ করে রইলো।

দিবানাথবাবু আবার বলতে লাগলেন—ও বললে কোর্টে প্র্যাকটিস করলে অনেক গরিব লোকদের উপকার করা যাবে। ও বলতো—যাদের পয়সা আছে তারা অন্যায় করলেও মামলায় জেতে। ও নাকি গরিব লোকের উপকার করবার জন্যই কোর্টে প্র্যাকটিস করবে। বলুন তো ও কি ধরনের এ্যাডভোকেট—। জানি না আপনাদের কোর্টে এরকম এ্যাডভোকেট আর ক'জন আছে—

অংশুমান ঘোষ কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলো। কি আর বলবে সে ? কি আর বলবার অধিকার আছে তার সিনিয়ারের সম্বন্ধে।

দিবানাথবাবু উঠলেন।

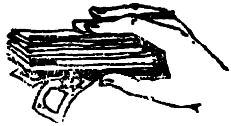
বললেন—যাক গে, এ-সব কথা আপনি আবার যেন খোকাকে বলবেন না। আপনি কাজ করুন এখন। আমি আপনার কাজের অনেক ক্ষতি করে গেলুম—

এতক্ষণে একজন মক্কেল এসে ঘরে ঢুকলো—

জিজ্ঞেস করলে—উকিল সাহাব নেই ?

অংশুমান বললে—আপ বৈঠিয়ে, আবভি আ রহা হ্যায়—

দিবানাথবাবু বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।



দেখুন, আমার কথা বলতে গিয়ে আমি আজ আর একজন মানুষের কথা বলবো। তাঁর নাম ল্যাভোজিঁয়া। তিনি জাতিতে ছিলেন একজন ফ্রেঞ্চ। ফরাসী দেশের নাগরিক। পৃথিবীর সব শিক্ষিত মানুষই তাঁর নাম জানেন।

অত বড় মানব-প্রেমিক মানুষ আমাদের পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মেছেন। কিছু মানুষ যে আজ পৃথিবীতে এখনও সুস্থ হয়ে বেঁচে আছে, এর সমস্ত কৃতিত্ব সেই ফরাসী বৈজ্ঞানিকের। আজ বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। একদিন টাইফয়েড রোগ হলে মানুষের নির্ঘাৎ মৃত্যু হতো। একদিন ম্যালেরিয়া হলেও মানুষের নির্ঘাৎ মৃত্যু হতো। সে সব রোগের ওষুধ যাঁরা বার করেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন মহাপুরুষ।

কিন্তু তাঁদেরও আগে বিশেষ করে আর একজন মহাপুরুষের কথা আমি বলবো আপনাদের কাছে। বলতে গেলে তিনিই আমার আদর্শ। আমার কথা বুঝতে তাঁর জীবনী আপনাদের জানা দরকার। তাঁর শিক্ষা, তাঁর সংগ্রাম, আমাকে বরাবর বলতে গেলে প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর আদর্শ আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি নিজের জীবন বলিদান দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই আমিও তাঁর মত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যাবো বলে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এতে যদি আমার মৃত্যুও হয় তাহলেও আমি সত্য বলতে দ্বিধা করবো না।

সেই মহাপ্রাণ ল্যাভোজিঁয়ার জীবন-কাহিনী আপনারা শুনুন।

মহামান্য আদালতের সেই জজের কক্ষে যত শ্রোতা আর দর্শক ছিল তারা সবাই রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে মানুষ অনিন্দ্য সেনের বক্তব্য শুনতে লাগলো। বিশেষ করে

এ্যাডভোকেট অংশুমান ঘোষ আর ডাক্তার পরমার্থ বোস। অর্থাৎ 'লাইফকিওর নার্সিং হোম'এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ডাক্তার পরমার্থ বোসেরই যেন আরো বেশী আগ্রহ। ডাঃ পরমার্থ বোস এ্যাডভোকেট অংশুমান ঘোষের কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন—অনিন্দ্যবাবু এ কার কথা বলছেন? কে ল্যাভোজিঁয়া?

অংশুমান ঘোষ বললো—শুনুন না আগে কি বলেন উনি…

ডাক্তার পরমার্থ বোস চুপি চুপি বললো—আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে ভাই—

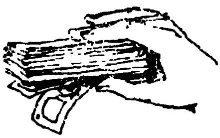
অংশুমান জিজ্ঞেস করলো—কিসের সন্দেহ?

ডাক্তার পরমার্থ বোস বললো—মিস্টার সেন যদি সব ব্যাপারটা ফাঁস করে দেন?

অংশুমান ঘোষ বললো—ফাঁস করে দিলে আমরাও ওঁকে ফাঁসিয়ে দিতে পারি—

ডাক্তার পরমার্থ বোস বললো—আরে, মিসেস সেন যখন আমাদের সাইডে আছেন তখন আমাদের ভয় কি?

ওদিকে অনিন্দ্য সেন তখন আবার তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করেছেন…



মানুষের জীবন বড় জটিল। আর বিশেষ করে বিচারক অনিন্দ্য সেনের জীবন যেন জটিলতর।

অনিন্দ্য সেন বরাবর নিজের ইচ্ছেমতই নিজের জীবনটা চালিয়ে গেছেন। নিজে যেটা ভালো বুঝেছেন, তাই-ই করে গেছেন। বাবা বা মা বা স্ত্রীর কথায় চলবার মত দুর্মতি তাঁর কখনও হয়নি।

তাঁর একমাত্র সুহৃদ ছিলেন তাঁর মাস্টার সাহেব। মোহম্মদ আশিফই সেই সুহৃদ। মোহম্মদ আশিফই তাঁকে 'মানুষ' নামের বইটা উপহার দিয়ে তার জীবনটাকে আমূল বদলে দিয়েছিলেন। তখনই অনিন্দ্য বুঝতে পেরেছিল যে এ-পৃথিবীর যত কিছু মূল অশান্তি তা কেবল অর্থকেই কেন্দ্র করে। সেই জন্যেই সে বাবার অফিসের দেওয়া চাকরিটা নেয়নি। সে-চাকরি নিলে তার জীবনে এত অশান্তিও হতো না, আর এত জটিলতারও সৃষ্টি হতো না। সে অবাক হয়েছে এই ভেবে ভেবে যে এত জিনিস থাকতে মানুষ অর্থকেই বা এমন করে ভালবাসে কেন?

এ ভাবনাটা তার ছোটবেলা থেকেই আছে। শুধু ভাবনাটা যে আছে তা-ই নয়, ভাবনাটা তাকে পীড়িতও করেছে।

ক্লাসের অন্য সব ছেলেরা বাড়ি থেকে হাত-খরচের পয়সা পেত। সেই পয়সা দিয়ে তারা টিফিনের সময় কত কী খাবার-টাবার কিনতো। কিন্তু অনিন্দ্যর কাছে কখনও পয়সা-টয়সা থাকতোও না, বাবার কাছ থেকে কখনও সে পয়সা চাইতো না।

দিবানাথবাবু মাঝে মাঝে তাকে জিজ্ঞেস করতনে—তোমার হাত-খরচের পয়সা দরকার হয় না?

অনিন্দ্য বলতো—না।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করতেন—তোমাদের ইস্কুলে তো আধঘণ্টার জন্য টিফেনের ছুটি হয়?

—হ্যাঁ হয়।

—সে সময় ছেলেরা কিছু খায়-টায় না?

অনিন্দ্য বলতো—হ্যাঁ খায়।

—আর তুমি? তুমি কিছু খাও না? তোমার ক্ষিধে পায় না?

অনিন্দ্য বলতো—আমার তো বাড়ির কাছে ইস্কুল, সকাল এগারোটায় খেয়ে ইস্কুলে যাই আর বিকেল চারটের সময় ছুটি, তারপরে বাড়িতে এসে খাই।

দিবানাথবাবু তখনই ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে যেতেন। এ কী রকম ছেলে তাঁর? অন্য বাড়ির ছেলেরা পয়সার জন্যে বাবাদের কাছে কত বায়না করে, আর তাঁর ছেলের কিনা পয়সার দরকারই হয় না। এও তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

তখন ছেলের এই ধরনের ব্যবহারের জন্যে দিবানাথবাবুর মনে কিন্তু খুব গর্ব হতো। তিনি ভাবতেন তাঁর ছেলে বয়েস হলে নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ কিছু হবে।

শেষকালে তিনিই নিজে থেকে ছেলেকে টাকা দিতেন। বলতেন—এই নাও টাকা।

অনিন্দ্য টাকাটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করতো—কীসের টাকা?

বাবা বলতেন—তোমার কিছু হাত-খরচ দরকার হলে খরচ কোর।

অনিন্দ্যর তখন খুব ফুটবল খেলার নেশা ছিল। ক্লাবের চাঁদা মাসে আট আনা। সেই টাকা থেকে আট আনা ক্লাবের চাঁদা দিয়ে বাকি আট আনা বাবাকে ফেরত দিত।

দিবানাথবাবু আট আনা পয়সা ফেরত পেয়ে অবাক হয়ে যেতেন।

বলতেন—আট আনা পয়সা কীসের?

অনিন্দ্য বলতো—সেই যে আপনি একটা টাকা আমাকে দিয়েছিলেন, তার থেকে ক্লাবের চাঁদা দিয়েছি আট আনা, আর বাকিটা ফেরত দিচ্ছি।

এ-সব হচ্ছে ছোট বেলাকার ঘটনা। দিবানাথবাবু তখন ভেবেছিলেন যে ছেলে এখন ছোট তাই পয়সার ওপর তার তত টান নেই। ভেবেছিলেন বয়েস হলে সব বদলে যাবে। কিন্তু এখন এ্যাড্‌ভোকেট হয়েও যখন বদলালো না তখন তাকে নিয়ে কী করা যায়?

সুভদ্রা এ-সব ব্যাপারে কখনও থাকেনি, আর থাকবেও না। তবু তাকে কথাটা বলা ভালো।

একদিন স্ত্রীকে একান্তে পেয়ে দিবানাথবাবু বললেন—জানো, আজকে খোকার জুনিয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলুম।

সুভদ্রা কিছু উত্তর দিলে না।

দিবানাথবাবু বললেন—দেখ খোকার জুনিয়ার নিজের ফিজ্ বাড়িয়ে নিয়েছে, আর খোকা তার ফিজ্ বাড়ায়নি। আগেও যে-ফিজ্ সে নিত, এখনও তাই নিচ্ছে। তা নিজের ভালো যে বোঝে না তাকে আমি আহাম্মক ছাড়া আর কী বলবো?

সুভদ্রা বললে—যার কপালে যা আছে তা কে খণ্ডাবে বলো? তুমি আর খোকার কথা ভেবে ভেবে শরীর খারাপ কোর না, খোকার যা ইচ্ছে তাই করুক গে।

দিবানাথবাবু বললেন—আমার তো ওই স্বভাব! সব সময়ে কেবল অনিন্দ্য কথাই মনে পড়ে। মনে তো ভাবি আমি কিছু বলবো না, অথচ আবার কিছু না বলেও পারি না।

সুভদ্রা বললে—আমরা খোকাকে মানুষ করে দিয়েছি, তাতেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা আর ক'দিন, আমরা চলে গেলে তখন ওদের ভালো ওরাই বুঝবে।

দিবানাথবাবু বললেন—তা তো বটেই, এই দেখ না আমি মন-প্রাণ দিয়ে চাকরি করেছিলুম বলে তবু এখনও মোটা টাকার পেনশন্ পেয়ে যাচ্ছি। কারোর কাছে আমাকে এখনও হাত পাততে হচ্ছে না। যদি পেনশনটা না পেতুম তাহলে কী হতো বলো দিকিনি?

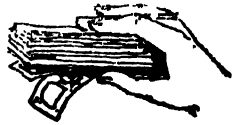
দিবানাথবাবু যখন এই সব চিন্তাতেই বিব্রত, তখন সংসারের চাকা তার আপ[illegible] নিয়মেই গড়িয়ে চলেছে। ইতিহাসের চাকার মতই সংসারের সে-চাকা অমোঘ এব[illegible] অনিবার্য। ইতিহাসের যেমন উত্থান-পতন আছে, মানুষের সংসারেরও আছে তেমনি উত্থান-পতন। ইতিহাসের যেমন এক-একটা যুদ্ধ-বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ যুগ থাকে সংসারেরও তেমনি থাকে রোগ-শোক-ব্যাধি-দারিদ্র্য-জর্জরিত সময়-সীমা। সেই সময়ে যাবতীয় মানুষ সাংসারিক মানুষের মতই অতিষ্ঠ হয়ে কখনও ভাগ্য-বিধাতার স্মরণ নেয়, আবার কখনও বা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আবার সেই সংসারই কখনও সাময়িকভাবে শীতকালের নদীর মত নিস্তরঙ্গ কিংবা কখন[illegible] বরফ-আচ্ছাদিত হয়ে থাকে।

কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন ক[illegible] অকিঞ্চিৎকর।

তবু সেই অকিঞ্চিৎকর জীবন নিয়েই মানুষ কত অমানুষের মত আচরণ ক[illegible]

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কত হানাহানিতে জড়িত হয়ে পড়ে। আর এর পেছনে যে কারণটা সব-কিছুর মূল তা হচ্ছে টাকা।

সেই টাকাকে কেন্দ্র করেই এ-বাড়িতে প্রথম অশান্তির সৃষ্টি হলো। আর তারই পরিণতিতে এই কাহিনীর নায়কের মত অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ল্যাভোজিয়ারের প্রাণ দিতে হলো।



কিন্তু কে এই ল্যাভোজিয়া ?

আজকের পৃথিবীতে মানুষরা ল্যাভোজিয়াকে চেনে না। আজকের পৃথিবীর আমরাও তাঁর নাম শুনিনি। কিন্তু অনিন্দ্য সেন শুনেছে। মোহম্মদ আশিফের সেই 'মানুষ' নামের বইটা থেকেই সে তাঁর নাম শুনেছে। মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে ল্যাভোজিয়ার অবদানের শেষ নেই। তাঁকে ভাঙিয়েই আমরা এখনও খেয়ে পরে বেঁচে আছি, অথচ তাঁর নাম জানি না আমরা। কত বড় ট্র্যাজেডি আমাদের জীবনের !

আমরা পৃথিবীর সব মানুষেরা যারা বেঁচে আছি তারা কীসের জন্যে বেঁচে আছি ?

এর উত্তর দিয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই বৈজ্ঞানিক। হাওয়াই তো আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই হাওয়া বস্তুটা কী ?

এই হাওয়ার মধ্যে কী-কী উপাদান আছে ?

এই হাওয়ার উৎপত্তি কী সে হলো ? এই নিয়ে বহুদিন বহুকাল ধরে বৈজ্ঞানিকরা বহু বছর ধরে গবেষণা করে আসছেন। তাঁদের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল এই যে পৃথিবীর যত জীব, জন্তু, গাছ-পালা আছে, তারা বেঁচে থাকে কেন, আর একদিন তারা মারাই বা যায় কেন ?

এর একমাত্র কারণ হাওয়া।

হাওয়া মানে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডায়োক্সাইড, এ্যামোনিয়া, ওজোন, নিওন, ক্রাইটোন, হাইড্রোজেন, এমনি আরো ছোট-খাটো অনেক কিছু জিনিস। এই যে আমাদের দেশে হাওয়াকে শুদ্ধ রাখার জন্যে এত আয়োজন এত সংবাদ এত লেখালেখি চলছে, আগে কি এ সবের ততো দরকার ছিল ?

আমাদের মহামান্য আদালতই কি আগেকার মত আছে ? আগে পৃথিবীতে এত মানুষও ছিল না, এত অ্যাড্ভোকেটও ছিল না।

নাইট্রোজেন যেমন বাতাসকে দূষিত করে তেমনি কিছু কিছু মানুষের স্বভা চরিত্রের জন্যে আদালতও দূষিত হয়ে ওঠে।

সেদিন দিবানাথবাবুর প্রশ্নে অনিন্দ্যও এই উত্তর দিয়েছিল।

দিবানাথবাবু ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তুমি এত কম ফিজ্ নাও কেন আজকাল সব জিনিসেরই তো দাম বাড়ছে, তাহলে তুমি বেশি ফিজ্ নিলে ক ক্ষতি?

অনিন্দ্য বলেছিল—তাতে আমার ক্ষতি, আমাদের সমাজের ক্ষতি, আমাদের দেশের ক্ষতি।

দিবানাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন—তার মানে?

অনিন্দ্য বলেছিল—আমি কোর্টের পবিত্রতা বজায় রাখতে চাই।

দিবানাথবাবু তবু ছেলের কথার মানে বুঝতে পারলেন না। বললেন—আ' তো তোমার কথার মানেই বুঝতে পারছি না। তুমি কথাটা সোজা ক বলো।

অনিন্দ্য বললে—বহুদিন আগে ল্যাভোজিঁয়া বলে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলে ফ্রান্সে। তিনি বাতাসের পবিত্রতা বজায় রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এমন কি শেষ পর্যন্ত তার জন্যে তাঁকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল···

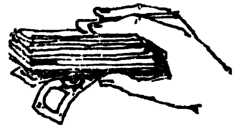
দিবানাথবাবুর কাছে তবু ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়নি। বলেছিলেন—কোথাকার কো বৈজ্ঞানিক বাতাসের পবিত্রতা বজায় রাখবার জন্যে কী করেছিলেন, তার সঙ্গে তোমাে কোর্টের কী সম্পর্ক? তার জন্যে তুমি টাকা কম নেবে কেন? তোমার কথ মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

—আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি বুঝিয়ে দিলেও আপনি বুঝ পারবেন না।

দিবানাথবাবু বললেন—তা ল্যাভোজিঁয়া মানুষটা কে?

অনিন্দ্য বললে—তিনি একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক—আমি তো বললুম আপনাকে তাঁর বায়োগ্রাফি পড়ে আমি আমার জীবনে যে-পথ বেছে নিয়েছি তাতে যদি আম জীবনও চলে যায় তাতে আমার কোনও দুঃখ থাকবে না।

দিবানাথবাবু যখন তাতেও কিছু বুঝতে পারলেন না, তখন তিনি হাল ছেড়ে দি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।



এর পর একদিন যা অবধারিত তাই-ই ঘটলো।

তখন অনেকগুলো ব্রীফ্ অনিন্দ্যর হাতে। অংশুমান আর অনিন্দ্য, দু'জনেই ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্ত। ক্লায়েণ্ট গরীব হলে অ্যাড্ভোকেটরা সাধারণতঃ তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। কিন্তু অনিন্দ্যর নিয়ম আলাদা। তার কাছে বড়লোক আর গরীব ক্লায়েণ্টের মধ্যে কোনও তফাৎ ছিল না।

অংশুমান বড়লোক ক্লায়েণ্টদের একটু বেশি খাতির করতো।

নানা ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সে আড়ালে যোগাযোগ রাখতো, আর নানাভাবে নানা কাজের উপলক্ষ্য করে আলাদা টাকাও নিত।

তারা অংশুমানকে বলতো—আমার কেসটার দিকে একটু স্পেশ্যাল নজর দেবেন ঘোষবাবু।

বলে পঞ্চাশটা টাকা অংশুমানের হাতে গুঁজে দিত।

এটা ছিল অংশুমানের নিজস্ব বাড়তি আয়। এ-টাকার কথা অনিন্দ্যর কানে যেত না। মক্কেলরাও কখনও এ-কথা অনিন্দ্যর কানে তুলতো না। কোর্টের বেঞ্চ-ক্লার্কদের যে-টাকা দিতে হতো তাও দেওয়া হতো অংশুমানের হাত দিয়ে। আসলে বেঞ্চ-ক্লার্ক কত পেত আর নিজের ভাগে অংশুমান কত রাখতো তা ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউই জানতে পারতো না।

শাঁসালো ক্লায়েণ্টরা দশটা কি বিশটা টাকা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতো না। কুড়িটা টাকা যদি অংশুমান পেশকারকে দেবে বলে নিত, তা থেকে পেশকার জানতেও পারতো না ঠিক কত টাকা তাকে দেবে বলে ক্লায়েণ্টের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অংশুমান জানতো কোর্ট মানেই হলো টাকার হরির লুট। নাচতে নেমে যেমন ঘোমটা দিতে যাওয়া অন্যায়, মামলায় নেমেও তেমনি মক্কেলদের পক্ষে দশটা বিশটা টাকা নিয়ে দর কষাকষি করাও অন্যায়। সেই সুযোগটা অনিন্দ্য না নিলেও নিত অংশুমান।

অংশুমান বলতো—আমি কী করবো বলুন, পেশকারকে তো অনেক বলি আমি। এত টাকা নিয়ে আপনারা করবেন কী মশাই? টাকা কি আপনাদের সঙ্গে যাবে? শ্মশানে যখন যাবেন তখন তো সব কিছু ছেড়ে এক কাপড়ে চলে যেতে হবে। সে কথাটাও কি একবার আপনাদের মনে পড়ে না?

যারা বড়লোক ক্লায়েণ্ট তারা তাতে আপত্তি করে না। পৃথিবীতে যেন তারা মামলা করতেই জন্মেছে।

তারা বলে—ঠিক আছে ঘোষবাবু, ওরা গরীব লোক, টাকা দিলে যদি কাজ হয়, তাহলে টাকা দিতে আমাদের আপত্তি নেই। এই নিন্ টাকা।

বলে তারা পকেট থেকে পাঁচটা দশ টাকার নোট বার করে দেয়।

অংশুমান ঘোষ টাকা ক'টা নিয়ে পকেটে পোরে। তারপর বলে—এই বেঞ্চ-ক্লার্কদের জন্যেই আমাদের এত বদনাম। মক্কেলরা ভাবে আমরাই বুঝি এতটাকা নিই।

ক্লায়েণ্টরা বলে—যা হোক দেখবেন, টাকা তো দিলুম, কিন্তু খুব শিগগির-শিগগির যেন মামলার তারিখটা পড়ে।

ক্লায়েণ্টরা চলে গেলে অংশুমান তখন টাকাগুলো পকেটে পুরে বাড়ি চলে যায়। বাড়িতে গেলেই ডিউটি শেষ নয়। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে কিছু গুঁজে আবার সিনিয়ারের বাড়ির আসরে গিয়ে বসতে হয়। সিনিয়ার অনিন্দ্য সেনও তখন তৈরি হয়ে নেয়। রাত আটটা থেকে আবার শুরু হয় সেই একঘেয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি। সেই ক্লায়েণ্ট, সেই ব্রীফ্, সেই মামলা, সেই টাকা দেওয়া-নেওয়া, সেই ফরিয়াদী, সেই আসামী আর সেই ডিফেনডেণ্ট, সেই প্লেনটিফ্…

এমনি করেই চলছিল অনিন্দ্য সেনের দৈনন্দিন জীবন। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ সেই অবধারিত ঘটনাটি ঘটলো।

দিবানাথবাবু সেদিনও রোজকার মত সকাল বেলা বাজারে গেছেন, তারপরে স্নান-টান সেরে দুপুর বেলা ভাত খেয়েছেন। তারপর দুপুর বেলা যেমন খানিকক্ষণ বিশ্রাম করেন তেমনি বিশ্রাম করেছেন। কিন্তু বেলা পড়ে এল তখনও দিবানাথবাবুর ওঠবার নাম নেই।

সুভদ্রা চাঁপাকে বললে—ওরে চাঁপা, দ্যাখ্ তো, ওঁকে ডাক। গিয়ে বল্ যে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চাঁপাও তাই করেছে। ঘরের ভেতরে গিয়ে ডাকলে।

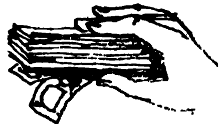
উনি তবু ঘুমিয়ে রইলেন। চাঁপা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—বাবা উঠছে না—ঘুমোচ্ছে।

সুভদ্রা রেগে গিয়ে বললে—তোকে দিয়ে কোনও কাজটা হবার নয়। ও কালিদাসী, যা তো মা, বাবুকে গিয়ে ডাক তো, গিয়ে বল্ গে, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এখুনি আসতে বল্।

কালিদাসী গিয়েও বাবুকে ডাকতে লাগলো—বাবু, ও বাবু, উঠুন, বেলা পড়ে এসেছে, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—উঠুন।

কালিদাসীর ডাকেও দিবানাথবাবু কোনও সাড়া দিলেন না। শেষকালে সুভদ্রা নিজেই সেই ঘরে গেল। ডাকলে—কী হলো, ওগো, চা খাবে না? ওঠো।

তাতেও যখন দিবানাথবাবু উঠলেন না, তখন সুভদ্রা দিবানাথবাবুর গায়ে হাত ঠেকাতেই চমকে উঠেছে। এ কি, এ যে…



এরপর আমার বাবা মারা গেলেন। বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন অনেক টাকা উপায় করি। আমি যেন লক্ষপতিই শুধু নয়, পারলে কোটিপতি হই। আমার যেন বিরাট বড় বাড়ি হয়, আমি যেন সমাজে গুণী-জ্ঞানী মানী মানুষ হিসেবে বিখ্যাত হই।

কিন্তু বাবা কখনও এটা চাইতেন না যে মানুষের জগতে আমি সৎ নির্লোভ নিরহঙ্কারী পরোপকারী আর ত্যাগী পুরুষ হই। আমাদের ভারতবর্ষে ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ী যা চেয়েছিলেন আমি তাই-ই চাইবো, এটা তিনি পছন্দ করেননি। মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—'যা নিয়ে আমি অমৃতা হবো না তা নিয়ে আমি কী করবো ?'

বাবার মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্যে আমার ওকালতি পেশাতে ব্যাঘাত ঘটলো। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি ব্যাপারে অনেক দিন কোর্টে যেতে পারলাম না। সেই সময়ে আমার কিছু কিছু কাজ আমার জুনিয়ার অংশুমান চালিয়ে দিতে লাগলো। যেগুলো খুব জটিল মামলা তার জন্যে মামলার তারিখ পিছিয়ে দিতে আবেদন জানালে।

অংশুমান বিচক্ষণ মানুষ। সে জানে ক্লায়েন্টদের কী করে হস্তগত করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরো জানে কী করে সীনিয়ারকেও আমার খুশী রাখা যায়। আমার তখন পিতৃ-শ্রাদ্ধের অশৌচ পালনের সময়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে চলছে আমার দিনগুলো। আমার মাও তখন শোকে কাতর। কালিদাসী আর চাঁপাও সেই সময়ে আমাদের সংসারে আরো একাত্ম হয়ে উঠেছে। আমাদের পিতৃ-শোক যেন তাদেরও স্পর্শ করেছে।

যাতে আমার কষ্ট না হয় তাই চাঁপাও ঠিক সময়ে আমার খাবারটা আমার সামনে এগিয়ে দেয়। সামনে গেলাস নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

আমি বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি—এটা কী ?

চাঁপা বললে—দুধ।

আমি বললাম—এখন দুধ খাবো না।

চাঁপা বললে—দুধটা খাও না, দুধ না খেলে তোমার শরীর যে ভেঙে যাবে! কিছু খাওনি যে তুমি।

আমি বললাম—না রে, এখন ক্ষিধে নেই।

চাঁপা তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলো—খাও খাও, ক্ষিধে না থাকলেও খাওয়া ভালো। মা তোমাকে খেতে বললে।

চাঁপার কথা এড়াতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই।

বললাম—হ্যাঁ রে, তুই খেয়েছিস তো?

চাঁপা বললে—আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

বললাম—দেখছিস তো বাড়িতে কেউ দেখবার নেই তোদের। তোরা ঠিক খাওয়া-দাওয়া করছিস তো?

চাঁপা বললে—বা রে, তুমি তো দেখছি বেশ মানুষ। আমরা কিছু খাচ্ছি না তো উপোষ করছি নাকি?

বললাম—তোদের খাওয়া-দাওয়া সব কিছু তাহলে ঠিক হচ্ছে তো?

চাঁপা বললে—হচ্ছে গো হচ্ছে, তোমাকে আর এই সময়ে তা নিয়ে ভাবতে হবে না।

—কী খাচ্ছিস কী, শুনি?

—বা রে, কী আবার খাবো, তোমরা যা খাচ্ছো আমরাও তাই খাচ্ছি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম—সে কী, তোরাও কি হবিষ্যি করছিস নাকি?

—ও মা, হবিষ্যি করবো কেন?

—তাহলে?

চাঁপা বললে—ওই ডাল ভাত আলুভাতে, এই সব খাচ্ছি।

—খেয়ে তোদের পেট ভরছে তো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমাদের জন্যে এই সময়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না—তোমার নিজের কত ভাবনা, তুমি তাই নিয়েই আগে ভাবো।

বললাম—না, মা তো এখন শুয়েই পড়ে আছে, আর আমিও কিছু দেখতে পারছি না, তাই এত কথা বলা।

তারপর দুধটা খেয়ে নিয়ে গেলাসটা তার হাতে ফিরিয়ে দিলাম। বললাম—মাকে একটু দেখিস তোরা, বুঝলি?

চাঁপা বললে—সে আমাদের বলতে হবে না। মা'র সব দিকে নজর আছে।

আমি বললাম—তোরা ছাড়া কেউ তো নেই আমাদের, এদিকে আমিও আমার অন্য কাজের মধ্যে সব কিছু দেখতে পারছি না বলেই এত কথা বলছি।

চাঁপা বললে—বউদিমণি তো দেখছে।

বলে চাঁপা চলে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ হলো তার খুঁটিনাটি বিবরণ আজ আর আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে অংশুমান আমার সব কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। তার সাহায্য না পেলে আমি পিতৃ-শ্রাদ্ধ অত সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারতুম না। অংশুমান ওই ক'দিনের মধ্যেই একেবারে আমাদের বাড়ির আপনজন

হয়ে পড়েছিল। অংশুমান মা'র কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিত। বলতো—আপনি অত ভেঙে পড়বেন না মা, যিনি গেছেন তিনি তো আর ফিরবেন না, তাহলে নিজের ওপর আর এত অত্যাচার করছেন কেন? আপনার সংসারের কথা একটু ভাবুন, আপনার ছেলের কথা, আপনার ছেলের বউ-এর কথাও তো আপনাকে ভাবতে হবে—

শুধু কি তাই? অংশুমান কল্যাণীর সান্নিধ্যেও এসে গিয়েছিল সেই ক'দিনের মধ্যে। আত্মীয়-স্বজন যারা নিকটের আর দূরের, তাদের কাছে তারাই গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমন্ত্রণ করে এসেছিল। আমি তাঁদের সকলের বাড়িতে যেতে পারিনি। যারা শুধু কাছাকাছি থাকতো তাদের বাড়িতেই আমি ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছিলাম।

আমার ব্যক্তিগত দুর্দিনে অংশুমান যা সাহায্য করেছিল তা আর কেউই করেনি —এ কথা আজ আমি অকপটেই স্বীকার করছি।

আর কালিদাসী?

আর কালিদাসীর মেয়ে সেই চাঁপা?

তাদের ঋণ কি আমি কখনও শোধ করতে পারবো? তারা ঠিক সময়ে খেতে পেয়েছে কি না তাও তো দেখবার সময় ছিল না কারো, আমার তো নয়ই।

তা একদিন-না-একদিন সকলের সব দুর্যোগই তো কেটে যায়। আকাশে মেঘ জমে, বৃষ্টি হয়, বন্যা এসে মানুষের আশ্রয়-স্থল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিজেদের প্রাণের তাগিদে অখাদ্য খেতেও বাধ্য হয়। ইতিহাসে তো এ-সব কথা লেখা আছে। যাঁরা ইতিহাস পড়েন তাঁরা এ-সব কথা জানেন।

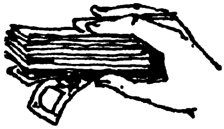
কিন্তু একদিন তো আবার আকাশে সূর্য ওঠে, আবার রোদে ঝলমল করে ওঠে গাছ-পালা, আবার মানুষ হাসে, আবার একদিন নতুন করে মানুষ সুখের নীড় বাঁধে, আবার আশায় বুক বেঁধে বংশধরদের জন্যে সম্পদ সঞ্চয় করে।

যখন মানুষ এই সব করে তখন মানুষের ভাগ্য-বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যেই হাসে। বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম, বড় নিরপেক্ষ সে-হাসি।

ঠিক আমারও তাই হয়েছিল।

শুধু আমার নয়, ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক ল্যাভোজিয়ারও তাই হয়েছিল।

সেই কাহিনীই আমি এখন বলি—



দিবানাথবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে কল্যাণীই সংসারের সমস্ত বোঝাটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। সে-ই রোজকার বাজারের টাকা তুলে দিত কালিদাসীর হাতে। বাজার থেকে কী কী কিনে আনতে হবে, বাড়িতে কী কী রান্না হবে, তা কল্যাণীই ঠিক করতো। তারপর প্রতিদিন একটা খাতায় রোজকার হিসেব-পত্র লিখে রাখতো। আর টাকা কম পড়লেই চাইতো অনিন্দ্য সেনের কাছ থেকে।

অনিন্দ্য বলতো—এর মধ্যেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল?

কল্যাণী বলতো—ফুরোবে না? জিনিস-পত্রের দাম কী হারে বাড়ছে তার তো খবর তুমি রাখো না।

অনিন্দ্য বলতো—একটু খরচ কমাতে পারো না? আমরা গরীব লোক, আমাদের গরীব লোকের মত থাকাই তো ভালো।

কল্যাণী বলতো—কিন্তু আর কত গরীব হবো বলো তো? দেখছো না, আমার গলায় কি একটা সোনার হার আছে যে তাই পরে থাকি? এর চেয়ে আর কত সাদাসিধে ভাবে থাকা যায়? এই দেখ না, সকলের বাড়িতে টি. ভি আছে, অনেকের আবার রঙিন টি. ভি-ও আছে। আমাদের বাড়িতে কি সাধারণ টি. ভি ও একটা কিনে দিয়েছ তুমি? আর কত গরীব হয়ে থাকবো বলো তো?

অনিন্দ্য কল্যাণীকে অনেক বোঝাতো। বলতো—দেখ, আমাদের মত গরীব দেশে ওই সব বিলাসিতা কি ভালো, তুমিই বলো না?

কল্যাণী বলতো—ও কথা বললে টেলিফোনটাও তো এক রকম বিলাসিতা।

অনিন্দ্য বলতো—কী বলছো তুমি? টেলিফোনটা বিলাসিতা হলো? আমার ক্লায়েন্টরা যদি তাদের কোনও জরুরী কথা আমাকে জানাতে চায় তো তখন কী করে জানাবে? ওটা তো নেসাসিটি, আমার কাজের অঙ্গ—

কল্যাণী তবু বুঝতে চাইতো না। বলতো—তুমি তো সারাদিন তোমার কোর্ট আর মক্কেল নিয়ে মেতে থাকো, আমি সারাদিন কী নিয়ে থাকি বলো তো?

সত্যি, এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারতো না অনিন্দ্য।

তখন কল্যাণী বলতো—সেই জন্যেই তো তোমাকে বলেছি তোমার ফিজ্ বাড়াও, সংসারের সব জিনিসের দাম বেড়েছে আর তোমার ফিজ্ বাড়ালে কী অন্যায়টা হয় শুনি?

এর পর অনিন্দ্যর আর কী বলবার ছিল তা কেউ জানতো না। কারণ বলতে গেলে অনিন্দ্যর এত কথা বলবার সময়ই থাকতো না কখনও। সকাল বেলা ঘুম থেকে

উঠে তৈরি হতে হতেই মক্কেলরা এসে হাজির হয়ে যেত, আর তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠিক সময়ে কোর্টে বেরিয়ে যেতে হতো। আর সূর্যের মত নিয়ম করে সন্ধ্যে বেলায় কোর্ট থেকে ফেরার পর চেম্বারে আবার ক্লায়েন্টদের ভিড় শুরু হতো। তার মধ্যে সংসারের কথা কল্যাণীর কথা কখন সে ভাববে?

একদিন অনিন্দ্য কোর্ট থেকে ফেরবার সময় অংশুমানকে বললে—দেখ অংশু, তোমার বউদি বলছিল একটা টি. ভি কিনতে চায়। দেখ তো, কী বিপদ!

অংশুমান বললে—বিপদ কেন বলছেন অনিন্দ্যদা? টি. ভি বিপদ?

অনিন্দ্য বললে—বিপদ নয়? শুনেছি টি. ভি'র তো অনেক দাম!

অংশুমান বললে—অনেক দাম হলেও আজকাল সবাই-ই তো তা কিনছে।

অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলে—তুমি? তুমি কিনেছ?

অংশুমান বললে—তিন বছর আগেই কেনা হয়ে গেছে। আর শুধু কি আমার বাড়িতে? আমাদের পাড়ার সব বাড়িতেই আছে। আজকাল বস্তির বাড়িতেও সব দেখেছি। ঝুপড়ির মাথায় এ্যানটেনা লাগানো রয়েছে।

অনিন্দ্য বললে—যন্ত্রপাতি কেনা মানেই তো যত কিছু ঝঞ্ঝাট। কথায়-কথায় কলকব্জা বিগড়ে যাবে আর তখন মিস্ত্রি-মেকানিকদের পায়ে ধরে খোসামোদ করো। এ সব কি আমাদের মত লোকের পোষায়?

অংশুমান বললে—আমরা তো কোর্ট-কাছারি মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু যারা সারাদিন বাড়িতে থাকে তাদের কথাও তো একবার ভাবতে হবে। এই যে আমি। আমিই কি কখনও টি. ভি দেখি, না দেখবার সময় পাই? আর টি. ভি'র দামও তো বেশি নয়। যদি বলেন তো আমি একটা কিনে দিতে পারি।

অনিন্দ্য বললে—কী রকম খরচা পড়বে?

অংশুমান বললে—সে আপনাকে ভাবতে হবে না। দামটা না হয় ইনস্টলমেণ্টে দেবেন।

—ওসব আমি জানি না, টি. ভি কিনতেই যদি অত সময় নষ্ট হয় তো আমি কাজ করবো কখন?

সেদিনই অংশুমান কথা দিয়ে দিল যে টি. ভি কেনবার আর মেরামত করবার যে-সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সমস্তই সে-ই পোয়াবে, তার জন্য অনিন্দ্যকে কোনও ভাবনা-চিন্তা করতে হবে না।

সেই সূত্রেই তখন অংশুমানকে কল্যাণীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে হলো।

পরিচয়টা সেই দিবানাথবাবুর মৃত্যুর পরই শুরু হয়েছিল, কিন্তু দুজনের ঘনিষ্ঠতা শুরু হলো ওই টি. ভি কেনা নিয়ে। আর কোনও দামী জিনিস কেনা তো হুট্ করে একদিনে হয় না। তাতে পছন্দের প্রশ্ন আছে। এখানে ওখানে দশটা দেখে বাছাই করার প্রশ্নও আছে।

আর তারপর কল্যাণীকে এখানে ওখানে যেতে হলো অংশুমানের সঙ্গে।

কল্যাণী বলতো—আপনি ছিলেন বলেই তবু এত ঘুরতে পারলুম। উনি তো এ-সব কিছুই পছন্দ করেন না।

অংশুমান বলতো—আমি বুঝতে পারি না কেন উনি পছন্দ করেন না। মানুষের জীবনে অবশ্য কাজটা খুবই দরকারী, কিন্তু তা বলে কিছুই ভোগ করবো না, সেটা ভালো কথা নয়।

কল্যাণী বলতো—উনি বলেন এ-সব নাকি বিলাসিতা।

অংশুমান বলতো—টি. ভি যদি বিলাসিতা হয় তাহলে সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেই হয়।

কল্যাণী বলতো—আপনি না হয় সেটা বুঝলেন, কিন্তু সেটা ওঁকে আমি বোঝাই কী করে বলুন তো?

অংশুমান বললে—আমি নিজেও তো বুঝিয়েছি, আপনার শ্বশুরমশাইও অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু তার পরে আমি আর কী করতে পারি—আমি তো সামান্য ওঁর একজন জুনিয়ার।

কল্যাণী বললে—আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন।

অংশুমান বললে—আপনিই বলুন না আমি কী করতে পারি? মক্কেলদের কাছ থেকে উনি কিছুতেই যে বেশি টাকা ফিজ্ নেবেন না।

কল্যাণী বললে—আপনি নিজেই যা-হয় একটা রাস্তা বের করুন না।

অংশুমান বললে—দেখি, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।

এর বেশি কথা হতো না অংশুমানের সঙ্গে। তা ছাড়া এমন ভাবে কল্যাণীর সঙ্গে কথা হতো যাতে অনিন্দ্য সেন টের না পায়—তাই ঘন-ঘন অংশুমানের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে থাকলেও সে-সুযোগ হতো না কল্যাণীর।

কল্যাণী বলতো—দেখুন একদিকে উনি বিলাসিতা করতে ভালবাসেন না, আর অন্যদিকে বাড়িতে এতগুলো লোক খেতে। আমি এর খরচ চালাই কী করে বলুন তো? আমি, আমার শাশুড়ী, কালিদাসী আর তার আবার একটা জোয়ান মেয়ে চাঁপা—এত বড় জোয়ান মেয়ের দায় কি কম? খাওয়া-পরা ছাড়া ওই চাঁপারও তো বয়েস হচ্ছে। একদিন ওই চাঁপার তো বিয়েও দিতে হবে, বলুন, বিয়ে দিতে হবে না?

অংশুমান বলতো—তা তো দিতেই-হবে।

কল্যাণী বলতো—তা এ-সব দায় ঘাড়ে নেওয়া কেন বলুন তো? গরীব লোকের মেয়ে হলেও বিয়ে দিতেও তো একটা মোটা খরচ করতে হবে। নমো নমো করে বিয়ে দিলেও আজকালকার বাজারে হাজার দু'য়ের টাকার কমে তো কিছুতেই হবে না।

অংশুমান বললে—বরং তার চেয়ে বেশিই লাগবে।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—তা কালিদাসী কত টাকা মাইনে নেয়?

কল্যাণী বললে—মাইনেই নেয় ষাট টাকা। তার ওপর দু'জনের খাওয়া-পরা-থাকা সবই যোগাতে হয় আমাদের।

অংশুমান বললে—আজকালকার বাজারে দু'টো মানুষের খাওয়া-পরার খরচ কি কম হলো? কম করে তার ওপর আরো দু'শো টাকা ধরে নিন।

কল্যাণী বললে—এ-সব কথা আমি কাকে বলি বলুন? আপনার সিনীয়ারও যেমন, ও'র মাও ঠিক সেই রকম। আমি তো পরের বাড়ি থেকে এখানে এসেছি। আমি যদি এই ব্যাপার নিয়ে কিছু বলতে যাই তো তখনই আমার ঘাড়ে দোষ চাপবে।

অংশুমান যেন কল্যাণীর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বললে—না না, আপনি এ-সব ব্যাপারে কিছু বলতে যাবেন না! আপনার কীসের দায়?

কল্যাণী বললে—আপনি তো বলেই খালাস! আমার নিজের দায় নয় তো কার দায়, বলুন? এই সংসারের লোকসান তো আমার নিজেরই লোকসান! এ-সংসারের ক্ষতি তো আমার নিজেরই ক্ষতি।

অংশুমান বললে—তা তো বটেই।

—আপনি যদি দেখেন আপনার সংসার খরচের সব টাকা নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে তা হলে আপনার গায়ে লাগবে না?

অংশুমান বললে— তা তো লাগবেই।

—আমারও হয়েছে তাই! আমি যত টেনে-টেনে সংসার চালাচ্ছি, তত অন্যদিকের ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন হঠাৎ যদি কারো অসুখ-বিসুখ হয় তখন চালাবো কী করে? আজকাল নার্সিং-হোমের খরচের বহর তো জানেন?

অংশুমান বললে—কী বলছেন আপনি? নার্সিং-হোমের ব্যাপার জানবো না? আমার নিজের বন্ধুরই তো নার্সিং-হোম আছে একটা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—কী নাম?

অংশুমান বললে—ডাক্তারের নাম ডাক্তার পরমার্থ বোস। আমার ক্লাশফ্রেন্ড। আমরা দু'জনে ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়ে এসেছি। তারপর আমি চলে গেলুম ল'লাইনে আর সে চলে গেল ডাক্তারি লাইনে। তখন যে আমি ল'লাইনে এসে কী ভুলই করেছিলুম, তাই ভাবি···

—কেন?

—ভুল নয়? আমি আর ক'টা টাকাই বা মাসে উপায় করি! আর পরমার্থ দিনে কত উপায় করে জানেন?

—কত?

অংশুমান বললে—আমি বছরে টেনেটুনে বড়জোর দশ হাজার টাকার মত আয় করি। আর পরমার্থ ডাক্তারি করে দিনে দশ হাজার টাকা আয় করে।

কল্যাণী কথাটা শুনে চমকে উঠলো।

বললে—সে কী? দিনে দশ হাজার টাকা? সত্যি?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি আমি? তবে সবটা তো আর হোয়াইট টাকা নয়, ওয়ান-ফোর্থ টাকা সাদা, আর বাকিটা সব কালো। মানে কালো টাকা। তার ওপর ওকে কোনও ট্যাক্সই দিতে হয় না।

কল্যাণী বললে—উনি কিন্তু ইনকাম-ট্যাক্সের একটা টাকাও ফাঁকি দেন না, জানেন? যা টাকা পান সমস্তটার নিখুঁত হিসেব দেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে।

অংশুমানের কাছে এ-খবরটা জানা ছিল না। বললে—সে কী? সমস্তটার হিসেব দেন?

—হ্যাঁ। এত বোকা লোক আপনি কোথাও দেখেছেন?

অংশুমান বললে—অথচ আমরা তো কেউ তা দিই না। দিলে তো আমরা মরে যেতুম। পরমার্থও দেয় না। দিলে সে তো ধনে-প্রাণে মারা যেত। এখন তো বাজারে নতুন 'মারুতি' গাড়ি উঠেছে, পরমার্থ সেদিন এক সঙ্গে দুটো কিনে ফেললে।

কল্যাণী বললে—একসঙ্গে দুটো? সে তো অনেক টাকা দাম।

অংশুমান বললে—যত দামই হোক, তাতে পরমার্থের কী? ওর টাকাতে তো শ্যাওলা পড়ছে।

কল্যাণীর চোখ দু'টো বড় হয়ে গেছে অংশুমানের কথা শুনে।

বললে—কী করে এত টাকা আয় করে? সব নার্সিং-হোম থেকে?

—তাছাড়া আর কী?

কল্যাণী বললে—খুব বড় নার্সিং-হোম বুঝি?

অংশুমান বললে—'লাইফ কিওর নার্সিং হোমে'র নাম শোনেন নি? তার মালিকই তো পরমার্থ।

—তা সামান্য 'নার্সিং-হোম' থেকে দিনে অত টাকা ইনকাম হয় কী করে?

অংশুমান বললে—আজকাল সরকারী হসপিট্যালে তো ওষুধও থাকে না, ডাক্তাররাও তাদের নিয়ম-মত ডাক্তারি করে না। তাই আজকাল সবাই নার্সিং-হোমে যায়।

—কিন্তু অত রোগী নার্সিং-হোমে যায় কেন? কলকাতার লোকেদের কি অত টাকা?

অংশুমান বললে—না, তা নয়। তারা ওর নার্সিং-হোমে যায় বাধ্য হয়ে।

—বাধ্য হয়ে মানে?

অংশুমান বললে—সে-সব আপনার না শোনাই ভালো।

—না-শোনা ভালো কেন?

অংশুমান বললে—তবে আপনি যখন শুনতে চাইছেন তখন বলি। বেশির ভাগ রোগীই হচ্ছে মেয়েরা।

—তাই নাকি? কেন?

অংশুমান বললে—আসলে সব মেয়েদের একটাই রোগ—সেটা হচ্ছে যাকে বলে 'টার্মিনেশন অব্ প্রেগ্নেন্সি'।

—তাই নাকি?

কথাটা শুনে চমকে উঠলো কল্যাণী।

অংশুমান বললে—হ্যাঁ—

—আপনি সত্যি বলছেন?

অংশুমান বললে—দেখুন আপনার কাছে মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—এক-একটা কেস্-এ কত টাকা করে চার্জ নেন, আপনার বন্ধু?

অংশুমান বললে—ঢালা এক হাজার টাকা করে। কারো কারো কাছে আবার তার চেয়ে বেশিও নিয়ে থাকেন। সে-সব লোক বুঝে।

অংশুমান একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—আচ্ছা, আপনিই বলুন, আমাদের দেশের বাজারে যখন নানা-রকম লাক্সারি-গুড্স্ বেরোচ্ছে, তখন সে-গুলো তো আমাদের আরামের জন্যই বেরোচ্ছে! আমরা সেই আরামগুলো যদি ভোগই না করলুম তো আমাদের বেঁচে থেকে লাভ কী বলুন? আমার স্ত্রী কী বলে জানেন?

—কী?

—বলে গান্ধীটা একটা আহাম্মক। বিলেত থেকে ব্যারেস্টারি পাশ করে কোথায় আরাম করবে, কোথায় দু'হাতে টাকা উপায় করে একটু ভালো-মন্দ খাওয়া-দাওয়া করবে, কোথায় এয়ার-কন্ডিশন করা ঘরে বসে জীবনটা ভোগ করবে, তা নয়, কোপ্নি পরে খালি গায়ে বেড়ানো, একটা ভিখিরির মত সাজ করে বস্তিতে বস্তিতে বসে রামধুন গাওয়া, এটা কি তোর মত শিক্ষিত ভদ্দরলোকের কাজ হলো? অবশ্য মানুষটা মারা গেছে, এখন তার আর নিন্দে-টিন্দে করা উচিত নয়। কিন্তু এটা কী রকম কাণ্ড বলুন তো? আমি তো অনেক চেষ্টা করেও এর কোন মানে খুঁজে পাই না। আপনিই বলুন, আপনি এর কোনও মানে খুঁজে পান?

কল্যাণী বললে—আমি আর কী বলবো। আপনার সীনিয়ারও তো তাই। জানেন, আমাদের শোবার ঘরে উনি গান্ধীর একটা ফোগ্লা দাঁতের ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছেন। কোনও ঠাকুর-দেবতার ছবি রাখলে তবু তার মানে বুঝতে পারতুম,

কিন্তু এটা কী বলুন তো ? সব দেখে শুনে আমার মাঝে মাঝে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

অংশুমান বললে—আপনি মন খারাপ করবেন না বউদি। দেখি, আমি এর কিছু বিহিত করতে পারি কি না।

—আপনি আর কি বিহিত করবেন ?

অংশুমান বললে—কী বিহিত করবো তা তখনই আপনি জানতে পারবেন।

—আগে একটু আভাস দিলে আমি একটু মানসিক শান্তি পেতুম।

অংশুমান বললে—কিন্তু একটা কথা, কথাটা যেন এখন কাউকে বলবেন না।

—না, আপনি বলুন, আমি কাউকে বলবো না, কথা দিচ্ছি।

অংশুমান গলাটা নিচু করে বললে—মিস্টার সেনকে শিগ্‌গিরই জজের প্রমোশান দেওয়া হচ্ছে।

—সে কী ?

অংশুমান বললে—অত চেঁচাবেন না, ব্যাপারটা এখনও খুব সিক্রেট। আমি ভেতর থেকে খবরটা পেয়েছি। দিল্লীতে নাকি আরো কয়েকজন অ্যাড্‌ভোকেটের সঙ্গে মিস্টার সেনের নামটাও পাঠানো হয়েছে—সেখান থেকে এখনও কোনও উত্তর আসেনি।

খবরটা শুনে কল্যাণী কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে রইল! এ কি সত্যি ? এ কি সম্ভব ?

কল্যাণী খানিকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—জজ হলে কত টাকা মাইনে হবে ওঁর ?

অংশুমান বললে—মাইনে হবে মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা। তারপর আছে মটর গাড়ির অ্যালাওয়েন্স, একজন আর্দালি। আর তারপর যদি একটু-আধটু অন্য কিছু করেন তো আরো কয়েক হাজার টাকার আয় কে আটকায় ?

—'একটু-আধটু অন্য কিছু' মানে ?

—সে-সব পরে আপনাকে খুলে বলবো। আগে ব্যাপারটা কত দূর গড়ায় সেইটে তো দেখি।

সেদিন এর বেশি আর কোনও কথা হলো না। আর তা ছাড়া যখনই কল্যাণীর সঙ্গে যেটুকু কথাই হতো তাও তো অনিন্দ্য সেনকে লুকিয়ে চুরিয়ে। আমরা যারা সংসারে বাস করি তারা তো সব সময়েই এমন কাজ করি যাতে মানুষের কাছে আমাদের লজ্জায় না পড়তে হয়। যে অন্যায় কাজ আমরা গোপনে করি তার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে কারোর কাছে আমাদের দায়-বদ্ধ হয়ে থাকবার কোনও বালাই নেই। কারণ সে-কাজ তো বাইরের লোকেদের নজরে পড়ছে না।

কিন্তু তা বলে মনের অগোচরের পাপ কি পাপ নয় ?

তা পাপ-পুণ্যের যিনি নিয়ামক তাঁর কাছে কিন্তু গোচর-অগোচর বলে কোনও ফারাক নেই। তিনি সর্বজ্ঞ ; তিনি অবাঙ্মনসোগোচর। অনিন্দ্য সেন তাই যতদিন আইনের পেশা করেছেন ততদিন কখনও কোনও বেআইনী কাজ কিছু করেন নি। টাকা--আনা-পয়সার নিখুঁত হিসেব তিনি সরকারকে দিয়ে এসেছেন। তাতে তাঁর কতটা লাভ হলো বা কতটা লোকসান হলো সেদিকে কখনও নজর দেন নি।

কল্যাণীর বাপের বাড়ির দিকে কোনও আকর্ষণ ছিল না। সে বাপ-মা-মরা মেয়ে। দাদার সংসারে মানুষ হয়েছিল। দারিদ্র্য কাকে বলে তা সে অনেক মূল্য দিয়েই বুঝেছে। ইচ্ছে থাকলেও শখ-সৌখীনতা করবার কোনও অবকাশ বা সুযোগ সে পায়নি। স্কুলের বান্ধবীদের অনেককেই বিয়ের পর ঐশ্বর্যের শিখরে উঠতে দেখার যত সৌভাগ্য তার হয়েছে, মনে মনে কল্পনাতেই নিজের বিয়ের পরের জীবনের কথা ভেবে ততই সে আকাশ-কুসুম রচনা করেছে। ভেবেছে সেই শুভ দিন এলে সে সকলকে টেক্কা দিয়ে বাজিমাৎ করবে।

কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে কদিন বাস করেই সে বুঝতে পারলে যে তার কল্পনা করা আকাশ-কুসুম শুধু আকাশ-কুসুমই থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, এ-সংসারে থাকলে আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতই তাকে সমস্ত জীবনটা অপচয় করা ছাড়া আর কিছু করা তার দ্বারা সম্ভব হবে না।

মাঝে-মাঝে অন্ধকার ঘরের ভেতরে শুয়ে তার কান্না পেত। এ কোথায় কোন্ মানুষের হাতে সে পড়লো। এ-মানুষটার তো সময়ই নেই তার দিকে ফিরে তাকাবার। বউ-এর চেয়ে মক্কেলদের দিকেই তো মানুষটার বেশি নজর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মানুষটা বোধহয় মক্কেলদের কথাই বেশি ভাবে। প্রতিদিন কোর্টে মানুষটা যা টাকা-পয়সা উপায় করে তা সবই বাবার হাতেই তুলে দেয়, আর যখন যা খরচের দরকার হয় তা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেয়, শাশুড়ী কেউই নয় যেন। আর কল্যাণীও যেন কেউ নয় তার। আসলে যেন মক্কেল ছাড়া তার কাছে আর সবাই-ই পর। এর একটু ব্যতিক্রম শুধু চাঁপার বেলায়, চাঁপা নাকি ছোটবেলা থেকেই এ বাড়িতে আছে। সে যে জিনিসের বায়না করবে তাই-ই কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার জন্যে কিনে আনবে। এত কীসের মায়া! এত মায়া এত দয়া তো ভালো নয়।

কখনও ফ্রক কিনে আনবে, কখনও বা শাড়ি। কখনও মিষ্টি, কখনও খেলনা, কখনও কাচের চুড়ি, আবার কখনও জুতো। চাঁপা একটু আবদার ধরলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে আবদার পূরণ।

দিবানাথবাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন—বউমা, তোমার মুখটা অমন ভার ভার দেখছি কেন? খোকা কিছু ঝগড়া-টগড়া করেছে নাকি তোমার সঙ্গে ?

কল্যাণী শ্বশুরের সে প্রশ্ন কৌশলে এড়িয়ে গেছে। অন্য কথা বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করার পথ খুঁজেছে।

চেম্বারের ভেতরে মক্কেলদের কাজ-কর্ম সেরে যখন অনিন্দ্য ভেতরে আসতো তখন আধ-রাত। ঘুমে চোখ জুড়ে এলেও কল্যাণী জোর করে জেগে থাকতো। অনিন্দ্য ঘরের ভেতরে এসে তার বিছানায় গা এলিয়ে দিত।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করতো—তোমার কাজ এতক্ষণে মিটলো?

অনিন্দ্য বলতো—ও, তুমি এখনও জেগে আছো?

কল্যাণী বলতো—জেগে থাকবো না?

অনিন্দ্য বলতো—কেন মিছিমিছি জেগে থাকো বলো তো? আমি তো কতদিন বলেছি আমার জন্যে তুমি কষ্ট কোর না। তুমি ঠিক সময়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পোড়—

কল্যাণী কোনও উত্তর দেবার আগেই অনিন্দ্য আবার বলতো— তুমি তো জানো আমার অনেক কাজ থাকে রাত্তিরে। ওদের সকলের সঙ্গে কথা শেষ করে তখন কালকের কাজগুলোর ব্যাপারও ভেবে নিতে হয়। সেই সঙ্গে টাকা-কড়ির হিসেব-টিসেব সব লিখে নিয়ে তবে শুতে আসতে পারি।

কল্যাণী বলতো—কে তোমার কাছে তোমার কাজের কৈফিয়ৎ চাইছে? আমি কি সে-জন্যে কখনও তোমাকে কিছু বলেছি?

অনিন্দ্য বলতো—না, তুমি কিছু বলোনি, আমি নিজে থেকেই বলছি। একটা কাজ তুমি তো করতে পারো—

—কী কাজ?

—আমাদের পাড়ায় তো লাইব্রেরী আছে। অনেক ভালো ভালো বই আছে সেখানে। তুমি তো লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে যেতে পারো। বিস্তর গল্প উপন্যাসের বই সেখানে আছে। সে-সব বই আনিয়ে পড়লে তোমার সময়টাও ভালো কেটে যাবে। চাঁপাকে বলে দিলেই সে তোমার জন্যে বই এনে দিতে পারে।

—তুমি চাঁপার কথা আর বোল না!

অনিন্দ্য বলতো—কেন, চাঁপার ওপর তোমার অত রাগ কেন? ও তো খুব ভালো মেয়ে।

কল্যাণী চাঁপার নাম শুনলেই চটে যেত। বলতো—তোমায় আমি বার বার বলে দিয়েছি যে চাঁপার নাম তুমি আমার সামনে করবে না।

—কেন বলো তো, চাঁপা তো কোনও দোষ করেনি।

কল্যাণী বলতো—আবার তুমি আমার সামনে ওর নাম করছো?

অনিন্দ্য বলতো—কেন বলো তো? চাঁপার নাম তুমি সহ্য করতে পারো না কেন?

কল্যাণী বলতো—ও এ-বাড়ির কে?

অনিন্দ্য বলতো—ও কালিদাসীর মেয়ে, ওর বাবা বেঁচে নেই, ও একজন দুঃখী মেয়ে, বিধবা মা ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আমরা না দেখলে ওকে কে দেখবে?

—তা বলে ওর জন্যে তোমার এত দরদ কেন? তোমার এত কাজের মধ্যেও ওর জন্যে শাড়ি আনতে ব্লাউজ আনতে মিষ্টি আনতে খাবার-দাবার আনতে তো তোমার ঠিক মনে থাকে। তার বেলায় তো তুমি কিছু ভোলো না।

—তোমার জন্যে কোনও জিনিস আনতে কি আমি ভুলে যাই, বলতে চাও?

কল্যাণী বলতো—আমি কি কখনও কিছু তোমাকে আনতে বলেছি?

—কেন বলোনি? কে তোমায় বলতে বারণ করেছে?

কল্যাণী বলতো—আমি বলবো তবে তুমি আনবে?

—আনতে বলতে দোষ কী?

কল্যাণী বলতো—কী করে জানবো কিছু বলবার অধিকার আমার আছে কি না।

অনিন্দ্য বলতো—তুমি যে আমার স্ত্রী সেটা তো জানো?

—তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়েছে তখন নিশ্চয়ই আমি তোমার স্ত্রী।

—তা সেটা যখন জানো তখন এ-কথাটাও তোমার জানা উচিত যে স্বামীকে কিছু কিনে আনতে বলবার অধিকারও তোমার আছে।

কল্যাণী বলতো—সব স্ত্রীই এক রকমের কিনা তা জানি না কিন্তু সব স্বামীই কি এক রকম?

—ক'টা স্ত্রী আর ক'টা স্বামী তুমি জীবনে দেখেছ?

কল্যাণী বলতো—বেশি না দেখতে পারি কিন্তু আমার দাদা আর বউদিকে তো আমি দেখেছি। বেশ কাছ থেকেই আমি দেখেছি। আমার দাদা তো বউদিকে না-চাইতেই অনেক কিছু দেয়।

অনিন্দ্য এ-কথা শুনে কিছুক্ষণ হতভম্ভ হয়ে রইল। কী বলবে কিছু বুঝতে পারলে না।

কল্যাণী একটু থেমেই আবার বললে—আমার বউদি না-চাইতেই দাদা তাকে সব কিছু দেয়, কিন্তু আমাদের বাড়িতে তোমাদের বাড়ির মত ঝি-এর মেয়েকে কেউ লোহাগ করে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার কিনে দেয় না।

—চাঁপাকে তুমি ঝি-এর মেয়ে বললে?

কল্যাণী বললে—ঝি-এর মেয়েকে ঝি-এর মেয়ে বলবো না তো কী বলবো?

অনিন্দ্য বললে—জানো, কালিদাসী আর তার মেয়েকে আমরা ঝি বলে মনে করি না—তাদের আমরা অন্য চোখে দেখি।

—তারা যদি ঝি নয় তো কী? তাদের তোমরা কী বলে মনে করো? তাদের তোমরা কী চোখে দেখ?

অনিন্দ্য বললে—আমরা তাদের এ-বাড়ির লোক, আমাদের নিজেদের লোক বলেই মনে করি।

কল্যাণী বললে—আমাদের বাড়িতে আমরা কিন্তু ঝি-চাকরদের ঝি-চাকর বলেই মনে করি, আমরা তাদের অন্য চোখে দেখি।

অনিন্দ্য বললে—সেই জন্যেই তো তোমাদের বাড়িতে ঝি-চাকর কেউ টেঁকে না।

—কে বললে? কে বললে তোমাকে সে-কথা?

—কেন, তোমার দাদাই সেদিন আমাকে বলেছে। বলেছে বাজারের টাকা থেকে নাকি চুরি করেছিল সে। তাই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন লোক খুঁজছে। তা ঝি-চাকরকে ঝি-চাকর বলে মনে করলে ও-রকম তো হবেই। কালিদাসী কত কাল থেকে তো এ-বাড়িতে রয়েছে, কই, কখনও তো সে কিছু নেয়নি। বরং বাজার থেকে কিছু পয়সা বাঁচলে তাও সে বাবার হাতে ফেরত দিয়েছে—পুরো হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছে। তা এই সব কারণে এদের ওপর আমার কোনও কৃতজ্ঞতা থাকবে না? যাদের হাতে আমি মানুষ হয়েছি তাদের আমি ভালো দেখবো না?

কল্যাণী বললে—তাহলে আমার জন্যেও তোমার কিছু করা উচিত—আমিও তো তোমার কিছু কাজ করি।

—তোমার জন্যে আমি কী করবো, বলো?

কল্যাণী বললে—বললে তুমি রাগ করবে না, কথা দাও।

—কেন রাগ করবো? ভাল কথা বললে কি কেউ কখনও রাগ করে? বলো না আমি কী করবো?

কল্যাণী বললে—আমি সংসারের যা-যা কাজ করি তার জন্যে আমাকেও তোমার একটা মাসোহারা দেওয়া উচিত। যেমন কালিদাসী বা চাঁপাকে তুমি দাও।

—মাসোহারা? মাসোহারা মানে?

—মাসোহারা মানে মাইনে। এই ধরো মাসে আড়াই-শো টাকা করে আমাকে তুমি মাসোহারা দিলে।

অনিন্দ্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কী বলবে বুঝতে পারলে না।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে—কালিদাসী বা চাঁপার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তোমার সঙ্গেও কি আমাদের সেই সম্পর্ক? তুমি আর ওরা কি এক?

কল্যাণী বললে—এক নয়?

অনিন্দ্য বললে—না, এক নয়। তুমি হলে এ-বাড়ির বউ, আর ওরা হলো কাজের লোক।

কল্যাণী বললে—না, আসলে ওদের তুমি যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখো. আমাকেও তোমরা সেই একই দৃষ্টি দিয়ে দেখ। তফাৎ শুধু এই যে ওরা যে-কাজ করে তার জন্যে মাসোহারা পায় কিন্তু আমি যা কাজ করি তার জন্য মাসোহারা পাই না।

অনিরুদ্ধ বললে—কিন্তু আইন তো তা বলে না—আইন বলে যে স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অংশীদার।

কল্যাণী বললে—আইন তো অনেক কিছুই বলে, কিন্তু বাস্তবে কি তা মানা হয়?

—নিশ্চয়ই মানা হয়। নইলে আমরা এ্যাড্‌ভোকেটরা আছি কী করতে?

কল্যাণী বললে—ওসব বাজে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি আমাকে মাসে আড়াই-শো টাকা করে মাসোহারা দেবে কি না তাই বলো?

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে—তুমি কি কেবল ঝগড়া করেই রাত কাটিয়ে দেবে, ঠিক করেছ?

কল্যাণী বললে—তা ছাড়া আর কি? তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর কীই বা সম্পর্ক? সারাদিন তুমি তোমার মক্কেল আর কোর্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আর যখন মাঝ-রাত হবে তখন তুমি ঘরে শুতে আসবে! এই তো?

অনিরুদ্ধ বললে—যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তখন থেকেই তো তুমি জানতে যে তোমার ভাবী স্বামী উকিল।

—পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র উকিল, তা তো নয়। আরো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উকিল আছে, কিন্তু তারা কি সবাই তোমার মত? তারা ওকালতিও করে আবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও করে।

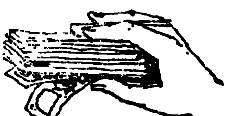
—তা আমি কি সংসার করি না?

কল্যাণী এ-কথার জবাবে হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধ তাকে বাধা দিয়ে বললে—থাক, আর তর্ক কোর না। পৃথিবীতে তর্ক করে কেউ জেতেনি, তর্ক করে কখনও কোনও জিনিসের মীমাংসা হয়ও নি। এক-কথায় তুমি কী চাও তাই বলো?

—আমি কি চাই তা তুমি জানো না?

—আর তর্ক কোর না। সোজা ভাবায় তুমি আমার কথার জবাব দাও। বলো, কী চাও তুমি?

কল্যাণী বললে—আমি টাকা চাই।



সমস্ত চেম্বার তখনও নিস্পন্দ-নিথর। এক-কথায় সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। শুধু অনিরুদ্ধ সেনের স্পষ্ট তীক্ষ্ণ শ্লেষাক্ত কণ্ঠস্বর যেন মন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত শ্রোতাদের মূক করে নির্বাক করে স্তম্ভিত করে রেখেছিল।

বেঞ্চ-ক্লার্ক তারাপদ চট্টোপাধ্যায় বহু বছর ধরে বিভিন্ন হাকিমের অধীনে কাজ করে এসেছে। আগেকার সমস্ত হাকিমকেই সে নিজের করতলগত করে রেখেছে এইটেই তার গর্ব আর গৌরবের বস্তু ছিল। বাড়িতে নিজের স্ত্রীকেও এ-ব্যাপারে সে অনেকবার নিজের অহঙ্কারের কথা শুনিয়ে এসেছে। কিন্তু আজকের এই অভূতপূর্ব ঘটনার আকস্মিকতায় সে যেন একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে।

অনিন্দ্য সেন যখন অংশুমানের নাম উচ্চারণ করলেন তখন প্রথমটায় কিছু বিব্রত বোধ করেছিলেন, কিন্তু 'লাইফ কিওর নার্সিং হোমে'র ডাক্তার পরমার্থ বোসের নাম উচ্চারণ করতেই যেন মনে মনে একটু স্বস্তি পেল। পরমার্থর দিকে চেয়ে অংশুমান চুপি চুপি বললে—কী হে, আমাদের সব কেলেঙ্কারীর কথা স্যার বলে দেবে নাকি?

পরমার্থ বললে—বলুক না। তাতে আমার কী? তা করলে তার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সেনের কথাও ফাঁস করে দেব আমরা। দেখি নিজের বউ-এর কেলেঙ্কারীর কথাও বলে কিনা অনিন্দ্য সেন।

অংশুমান বললে—এই সময়ে মিসেস সেন কোর্টে থাকলে ভালো হতো হে। স্বামীর সব কাণ্ড-কারখানা শুনতে পেত।

ডাক্তার পরমার্থ বোস বললে—ওই দেখ হে, চাঁপার বাবা চরণ দাস বাবাজীও এই ঘরের ভেতরে এসে বসেছে দেখছি।

অংশুমান বললে—তা তো আসবেই। চাঁপা খুন হয়ে গেছে, আর চরণ দাস বাবাজী আসবে না? ব্যাটা মহা শয়তান—ওই-ই তো এ মামলার ফরিয়াদী, আর ও এখানে থাকবে না?

কিন্তু তৎক্ষণে একটু দম নিয়ে অনিন্দ্য সেন আবার বলতে আরম্ভ করলেন—এইখানে আমি একটা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। ইতিহাসের হিসেবে তখন এইটিনথ সেঞ্চুরি। তখনও ফ্রান্সের রাজাদের যুগ চলছে। সিংহাসনে বসে আছে আর এক নরপশু সম্রাট। সেখানকার সেই পরমার্থ বোস তখন দেশের সর্বময় কর্তা। কিন্তু আসল রাজ্য চালায় মেরী এঁ্যাটোনিয়েত্। আর তাদের শাগরেদ হলো আর এক নরপশু—তার নাম অংশুমান ঘোষ।

এ-সব খবর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে বাস করেন যোশেফ্ প্রিস্টলি। সে ভদ্রলোক একজন মিশনারী। তিনি এ-সব নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর কেবল সাধনা কেমন করে মানুষের উপকার করা যায়। কেমন করে মানুষকে বাঁচানো যায়। তিনি সারা জীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য একটা রসায়ন আবিষ্কার করলেন। তার নাম দিলেন 'গ্যাস'।

অনেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে—এ দিয়ে মানুষের কি উপকার হবে?

প্রিস্টলি বললেন—যে-মানুষ মূর্ছা গেছে, যে মানুষ সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে ধুঁকছে, তাকে এই গ্যাসটা শুঁকতে দিলে সে আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

—তাহলে তো এটা একটা ওষুধ!

তা সেই মিশনারি সাহেব বেশিদিন বাঁচেন নি। কারণ তখন তাঁর বয়েসও হয়ে গিয়েছিল অনেক।

কিন্তু পৃথিবীতে যেমন অংশুমান ঘোষরা জন্মেছে, যেমন পরমার্থ বোসরা জন্মেছে, তেমনি আবার যোশেফ্ প্রিস্টলির মত মহাপুরুষরাও জন্মেছেন। জন্মেছেন বলেই তো এখনও মানুষ বেঁচে আছে।

এই প্রিস্টলির অসমাপ্ত কাজ নিয়ে তখন ফ্রান্সের আর একজন গবেষণা করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর নাম এ্যান্তনি ল্যাভোজিঁয়া।

তিনিই ছিলেন ফ্রান্সের সুবিখ্যাত মানব-হিতৈষী বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম শুনলেই মানুষ দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতো!

কেন দুই হাত জোড়া করে কপালে ঠেকাতো? কারণ মৃত্যুর হাত থেকে মানুষদের বাঁচানোই ছিল তাঁর সাধনা। এই দুঃখময় বিষময় পৃথিবীতে মানুষকে যদি একটু শান্তি একটু স্বস্তি দিতে পারেন সেইটেই ছিল তাঁর দিন-রাত্রির প্রচেষ্টা।

তাই দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটতো নিজের ল্যাবরেটারিতে। সকালে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যেবেলা সূর্য ডোবে, কিন্তু তিনি সব সময়ে সজাগ। তাঁর নিদ্রা নেই, তাঁর বিশ্রাম নেই। তিনি আপন অভিপ্রায়-সিদ্ধির তপস্যায় অবিচল।

মানুষ যেমন একদিকে অত্যন্ত ছোট, তেমনি আবার অন্যদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্র আমি, কেবলমাত্র আমার সুখ-দুঃখ, কেবলমাত্র আমার আরাম, কেবলমাত্র আমার আয়োজন আর কেবলমাত্র আমার প্রয়োজন, সে দিকটাতে আমার মতো ছোট আর কে আছে?

কিন্তু যে-দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমার সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যোগ, সে দিকে যখন তাকাই তখন আমার চেয়ে বড় আর কে আছে।

মঁসিয়ে ল্যাভোজিঁয়া পৃথিবীতে সেই রকম একজন বড় মাপের মানুষ। তিনি সব সময়ে ভাবতেন আমি যদি সকলের না হই, শুধু কেবল আমার হই, তাহলে আমার মানুষ জন্মটার সার্থকতা কোথায়?

এই রকম কথা ভেবেছিলেন সোক্রেটিস, এই রকম কথা ভেবেছিলেন মহাবীর, এই রকম কথা ভেবেছিলেন গৌতম বুদ্ধ, এই রকম কথা ভেবেছিলেন চৈতন্যদেব, এই রকম কথা ভেবেছিলেন যীশু খ্রীস্ট, এই রকম কথা ভেবেছিলেন হজরত মোহম্মদ, এই রকম কথা ভেবেছিলেন গুরু নানক, এই রকম কথা ভেবেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আর ভেবেছিলেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগের সেই মানবপ্রেমিক এ্যান্তনি লরেন্ট ল্যাভোজিঁয়া!

তিনি বিশ্ব-সৃষ্টির একেবারে মূলে গিয়ে গবেষণা চালাতেন। তিনি বলতেন—কোনও কারণ না থাকলে কোনও ঘটনা ঘটতে পারে না—কিছু-না-কিছু একটা কারণ থাকতে হবেই।

একদিন তার গবেষণাগারে একটু মৃদু টোকা পড়লো।

প্রথমে শুনতে পাননি মসিঁয়ে ল্যাভোজিঁয়া।

আবার টোকা পড়লো। এবার একটু জোরে।

তিনি হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাইলেন। ঘড়িতে তখন রাত দু'টোর সংকেত।

বললেন—কে ?

বাইরের থেকে কোনও জবাব এল না। নিজের গবেষণার মধ্যে আবার তিনি ডুবে গেলেন। আপেল ফল গাছ থেকে পড়ার পেছনে যদি কোনও কারণ থাকে তাহলে পাহাড় থেকে ঝরনা হয়ে জল-স্রোতের বেরিয়ে আসার পেছনেও তেমনি কোনও কারণ আছে নিশ্চয়ই।

সে কারণটা কী ?

তখন ফ্রান্সের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলছে। প্রজাদের মধ্যে তখন অসন্তোষের রোষ-বহ্নি জ্বলে উঠেছে। তারা বলছে আমরা খাবার চাই, তারা বলছে আমরা বাঁচতে চাই। তারা বলছে—তোমরা রাজা-রাণীরা বেশ তো আরাম করে খাচ্ছো দাচ্ছো-ঘুমোচ্ছ, এ আমরা সহ্য করবো না। আমাদের কথাও তোমাদের শুনতে হবে। আমাদেরও বড় রাস্তার ধারে তোমাদের মত বাড়ি চাই, আমাদেরও আরাম করে থাকতে দিতে হবে, আমাদেরও সময় কাটানোর জন্যে টি. ভি. দিতে হবে আমাদেরও টাকা দিতে হবে।

রাণীর কানেও একদিন মানুষের চাওয়ার আর্তনাদ এলো।

জিজ্ঞেস করলে—ও কে রে চাঁপা ?

চাঁপা বললে—ও সেই চরণ দাস বাবাজী।

—ও কী চায় ?

—ও চাল চাইতে এসেছে।

—চাল ? চাল কেন নেবে ?

চাঁপা বললে—চরণ দাস বাবাজীকে রোজ চাল দিই, পয়সা দিই···

কল্যাণী বললে—না, রোজ রোজ চাল দিতে হবে না। চালও দিতে হবে না পয়সাও দিতে হবে না—ও বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে খাক্ গে।

জোরে বলা কথাগুলো সুভদ্রার কানে গেছে। সুভদ্রা এগিয়ে এসে বললে—কী হয়েছে বউমা ?

কল্যাণী বললে—চাঁপা বলছে ভিখিরিকে নাকি চাল দেবে পয়সা দেবে।

সুভদ্রা বললে—ও ভিখিরি নয় বউমা, ও হচ্ছে আমাদের নিজেদের লোক।

এলেই তোমার শ্বশুর বরাবর ওকে চাল আর পয়সা দিতেন—ও বরাবর আমাদের মঙ্গল কামনা করে।

তারপর যা বরাবর করা হয় তা-ই করা হলো। চরণদাস বাবাজী গান গাইলে আর তারপর নিয়মমাফিক চাল আর পয়সা নিয়ে চলে গেল।

আর তার কয়েক দিন পরেই আবার দরজায় টোকা পড়লো।

ল্যাভোজিঁয়া তখনও মানুষের ভালোর জন্যে গবেষণা করে চলেছেন। মানুষের ভালো হোক, মানুষ সুখী হোক, মানুষ হিংসা ভুলুক, মানুষ মানুষ হোক—ল্যাভোজিঁয়ার শুধু এই একই সাধনা। নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে আমাদের সময় লাগে। তাই আমরা যে যথার্থ কী, আমরা যা করছি তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী, সেইটে স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়। তাই সাধনায় কোথাও কোনও ফাঁক বা ফাঁকি থাকা উচিত নয়। তাই ল্যাভোজিঁয়া দিন-রাত সেই সাধনাতেই নিমগ্ন হয়ে থাকেন।

সত্যিই তো, ল্যাভোজিঁয়া নিজেই মানুষ, তাই তো তিনি সমস্ত মানুষের। যেমন ফল তো শুধু একলা ফলেরই নয়, একেবারে শিকড় থেকে ডাল-পালা-পাতা নিয়ে সমস্ত গাছটার সঙ্গে তার মজ্জাগত যোগ।

আবার দরজায় টোকা পড়লো।

—কে ?

অনিন্দ্য সেন আবার বলতে লাগলেন—আমি দেখলুম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চীফ্-জাসটিসের চাপরাশি।

চাপরাশিটা বললে—সাহেব আপনাকে একবার ডেকেছেন হুজুর।

বার-লাইব্রেরীর সকলের কানেই কথাটা গিয়েছিল। আমি গেলুম তার আগে আগে। তারপর যে-গুজবটা শুনেছিলাম তা-ই সত্যি হলো। তার পর দিন থেকেই আমি বিচারক হয়ে গেলাম। আপনারা জানেন মহামান্য আদালতের বিচারকের পদের দায়িত্ব কী, আর বিচারকদের মাইনেই বা কত।

আমি বিচারকের চাকরি নিতে রাজি হলাম বটে, কিন্তু রাজি না হলেই বুঝি ভালো হতো। সেটা পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু রাজি না হয়ে ল্যাভোজিঁয়ারও তো সর্বনাশ হয়েছিল। ল্যাভোজিঁয়া সাহেব সেদিন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে তাঁর ল্যাবরেটরির দরজায় টোকা পড়তেই সেটা খুলে দিয়েছিলেন।

—কে ?

ঘড়িতে তখন মধ্যরাত। সামনেই একজন অপরিচিত লোকের মুখ।

—কে আপনি ? কী চান ?

লোকটা বললে—আমি মহারাণীর হুকুম-বরদার হুজুর। তাঁর হুকুমেই আমি হুজুরের কাছে এসেছি।

—আমার সঙ্গে মহারাণীর হুকুম-বরদারের কী সম্পর্ক? তিনি কী চান?

হুকুম-বরদার বললে—হুজুরের কাছে মহারাণীর একটা আদেশ আছে।

—কী সেই আদেশ?

হুকুম-বরদার বললে—হুজুর তো মানুষের জীবন বাঁচাবার জন্যে অক্সিজেন আবিষ্কার করেছেন?

ল্যাভোজিয়ঁা বললেন—হ্যাঁ, আমি অক্সিজেন আবিষ্কার করেছি বটে। তবে আমি একলা তা করিনি। আমার সঙ্গে আমার আরো চারজন সহকারী ছিল, তারা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে। তাদের সহায়তা না পেলে আমি তো তা আবিষ্কার করতে পারতাম না।

হুকুম-বরদার বললে—হ্যাঁ, আপনার সেই বই মহারাণী পড়েছেন। তিনি হুজুরকে এবার একটা বিষ আবিষ্কার করতে বলেছেন।

—বিষ?

হুকুম-বরদার বললে—হ্যাঁ হুজুর, বিষ।

—বিষ দিয়ে কী করবেন মহারাণী?

হুকুম-বরদার বললে—মহারাণীর প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

—কই, আমি তো কিছু শুনিনি। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে কেন?

—রুশোর একটা বই পড়ে প্রজারা মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

—রুশোর কী বই? কোন্ বই?

—রুশোর লেখা 'দ্য সোশ্যাল্ কনট্রাক্ট' বইটা প্রজাদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা বলছে ফ্রান্সের রাজা-রাণী, রাজার বংশধররা, রাজ-কর্মচারীরা সবাই অত্যাচারী। তাদের জন্যেই আজ প্রজাদের এত কষ্ট। এই সব প্রজারা সবাইকে খতম করার ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করেছে।

ল্যাভোজিয়ঁা বললে—তা আমি তাতে কী করবো?

হুকুম-বরদার বললে—আপনি এমন একটা বিষ আবিষ্কার করুন যা দিয়ে সব বিদ্রোহী প্রজাদের মেরে ফেলা যায়, সবাইকে খুন করে ফেলা যায়।

ল্যাভোজিয়ঁা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আমি মানুষকে মেরে ফেলবার বিষ আবিষ্কার করবো?

—হ্যাঁ, মহারাণীর তাই-ই ইচ্ছে, নইলে ফ্রান্সে আগুন জ্বলবে।

ল্যাভোজিয়ঁা হাসলেন। সে এক অলৌকিক শ্লেষের হাসি। বললেন—আমি মানুষকে বাঁচাবার জন্যে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি, আর সেই আমিই কিনা মানুষ মারবার বিষ আবিষ্কার করবো? তা আমার দ্বারা হবে না।

হুকুম-বরদার বললে—তাহলে কিন্তু হুজুরকে মহারাণীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ক্যাভোজি'য়া বললেন—যখন মহারাণী আমাকে জবাবদিহি করতে বলবেন আমি জবাবদিহি করবো।

হুকুম-বরদার বললে—আপনি বিষ আবিষ্কার করবেন না তো? আমি তাহলে মহারাণীকে সেই কথাই বলি গিয়ে?

—হ্যাঁ যাও, তাই বলো গিয়ে।

হুকুম-বরদার চলে যেতেই ক্যাভোজি'য়া আবার তাঁর গবেষণার মধ্যে মনঃসংযোগ করলেন।

অনিন্দ্য সেন এবার আর একটু দম নিলেন। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে বলতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—ক্যাভোজি'য়া মহারাণীর হুকুম-বরদারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি প্রধান বিচারপতির হুকুম প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। কারণ আমার স্ত্রী তখন আরো বেশি টাকা উপায় করবার জন্যে আমাকে বড় পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমি বিচারকের পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু পরে বুঝলাম বিচারপতি পদ গ্রহণ না করলেই হয়ত আমি ভালো করতাম। আমি আমার জন্যে একজন আর্দালী পেলাম। সেই আর্দালী হলো ভাগবত। ভাগবত নামে আমার আর্দালী হলো বটে, কিন্তু সে-ই ভাগবতই আমার বাড়ির সব কাজ করতে লাগলো। আর্দালী হয়ে গেল বাড়ির চাকর। ভাগবতের মাসকাবারী মাইনেটা দিতে লাগলো সরকার, কিন্তু সে সকাল সন্ধ্যেয় কাজ করতে লাগলো বাড়ির।

এই সময়ে কালিদাসী হঠাৎ মারা গেল। তারপর···



বর্তমানের মানুষ শুধু যে বর্তমানেরই, তা তো নয়। সে চিরকালের। ফ্রান্সের, গ্রেট ব্রিটেনের, জার্মানীর, আমেরিকার, ইণ্ডিয়ার সব দেশের সব রকম মানুষের সঙ্গে সব দেশের বর্তমান মানুষের ঐক্য আছে। যেমন সব দেশের সব মানুষই ক্ষমতা চেয়েছে, অর্থ চেয়েছে, সব কিছু চেয়েছে, তেমনি সব দেশের সব মানুষই আবার অন্যের ক্ষমতা হরণও করেছে, অন্যের অর্থ চুরিও করেছে, অন্যের সব কিছু আত্মসাৎও করতে চেয়েছে। এ-ব্যাপারে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোন তফাৎ নেই। এমন কি ভবিষ্যতেরও কোনও তফাৎ থাকবে না।

তফাৎ শুধু এই যে তারই মধ্যে এক-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে আর তাঁরা এসে বলবেন—তোমরা সৎ হও, তোমরা ভালো হও, তোমরা ভালোবাসো,

তোমরা মানুষ হও। আরো বললেন—তোমরা পাপকে ঘৃণা কোর, পাপীকে ঘৃণা কোর না। আরো বললেন—যে জিনিস টাকা দিয়ে কিনতে পাই তাতে আমাদের যে-সুখ সে অহংকারের সুখ। কিন্তু এই সুখ মানুষের সবচেয়ে বড় সুখ নয়। আমাদের চেয়ে যা বড় তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা সুখ।

এই ভালোবাসার বাণী, এই করুণার বাণী, এই অহিংসার বাণী কোনও একটা বিশেষ মহাপুরুষের, কোনও একটা বিশেষ দেশের বাণী নয়, এ বাণী সমস্ত কালের সম্পদ, সমস্ত মানব-জাতির সম্পদ।

মজা এই যে আমেরিকার মহাপুরুষ হেনরি ডেভিড্ থোরো সর্বপ্রথম অহিংস সত্যাগ্রহের কথা প্রচার করলেন। ইণ্ডিয়ার মহাত্মা গান্ধী পরাধীন ভারতে সেই অহিংস সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করে ভারতকে স্বাধীন করলেন। আবার সেই মহাত্মা গান্ধীর কাছে অহিংস সত্যাগ্রহের শিক্ষা পেয়েই আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে মানুষের মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব কোনও বিশেষ দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

অনিন্দ্য সেনের সংসারে কালিদাসীর মৃত্যুটাও এমন আকস্মিকভাবে ঘটলো যে সত্যিই তার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। সুভদ্রা কাঁদতে লাগলো খুব। বহুকাল ধরে কালিদাসীর কাছ থেকে সংসারের সবাই মমতা পেয়ে এসেছে, সেবা পেয়ে এসেছে, পরিচর্যা পেয়ে এসেছে।

খবরটা পাওয়া মাত্র অনিন্দ্য সেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলবার জন্যে চাঁপাকে চেক কেটে দিলে।

কল্যাণী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কত টাকার চেক দিলে?

অনিন্দ্য বললে—ব্যাঙ্কে সামান্য যা কিছু ছিল সবটাই তুললাম।

—সব মানে?

—ওই তো পাঁচ হাজার টাকার মতই ছিল ব্যাঙ্কে! তার বেশি তো ছিল না।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—অত টাকা? অত টাকা কীসে লাগবে?

অনিন্দ্য বললে—তা লাগবে না? কালিদাসী কি আমাদের পর ছিল? আমার বাবার শ্রাদ্ধে যে-রকম খরচ-খরচা হয়েছিল কালিদাসীর শ্রাদ্ধতেও সেই রকম খরচা লাগবে।

—সে কী? তুমি বলছো কী? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

অনিন্দ্য বললে—তুমি তো জানো না, তাই ও-কথা বলছো। তুমি যখন জন্মাওনি তখন থেকেই ও আমাদের বাড়িতে আছে। এ-বাড়িটাকেই ও বরাবর নিজের বাড়ি মনে করে এসেছে—এর কোন দাম নেই? এ-ঋণ কি টাকা দিয়ে শোধ করা যায়? বাবার মৃত্যুর পর এ-বাড়িতে যেমন আমরা সবাই অশৌচ পালন করে এসেছি, কালিদাসীর মৃত্যুর পরও সেই একই ভাবে অশৌচ পালন করা হবে।

—আর তুমি ? সেবারের মত তুমিও কি তাহলে ততদিন চামড়ার জুতো পরবে না, গায়ে জামা চড়াবে না, দাড়ি কামাবে না ?

অনিন্দ্য বললে—না।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তোমার চাকরি ? তোমার কোর্ট ?

—অশৌচ অবস্থাতে তো কোর্টে যেতে বারণ নেই। বাবার মৃত্যুতেও তো তাই করেছি। পায়ে রবারের চটি পরেছি।

কল্যাণী বললে—এখন তো তুমি ছুটিও নিতে পারো, এখন তো তুমি আর এ্যাড্‌ভোকেট নও। ছুটি তো তোমার পাওনাও হয়েছে। ছুটি নাও না।

অনিন্দ্য বললে—ছুটি দেবার যিনি মালিক তিনি যেদিন ছুটি দেবেন সেই দিনই আমি ছুটি নেব।

—তাহলে কোর্টের অন্য জজ্‌রা কি তাঁদের বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে ছুটি নেন না ?

অনিন্দ্য বললে—অন্যরা কী করেন না করেন তা আমি জানতে চাই না। আমার কী করণীয় তাই-ই আমি ভাবি। তা ছাড়া কোর্টে এখন অনেক কম জজ, অনেকে রিটায়ার করে গিয়েছেন, এখন আমরা আটজনে কাজ চালাচ্ছি—। অথচ হাজার হাজার কেস জমে যাচ্ছে।

—তা হাজার-হাজার কেস জমে গেলে তুমি কী করবে ? সে-দায় কোর্টের, তোমার কী ?

অনিন্দ্য বললে—আমার ক্ষতি নয়, তা বুঝতে পারছি, কিন্তু মানুষের দুর্দশার কথা একবার ভাবো। কত লক্ষ লক্ষ লোক সুবিচারের জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে তা জানো ? বিচারের দেরিও তো এক ধরনের অবিচার।

এ-কথার পর আর কথা চলে না।

কল্যাণীর দাদা একদিন সব শুনে হতবাক। সুবোধ আর দশ-পাঁচজনের মত গেরস্থ লোক। বললে—সে কী রে ? তুইও এতদিন মাছ-টাছ না খেয়ে আছিস নাকি ? তুইও চুলে তেল টেল কিছু দিচ্ছিস না ? তুইও হবিষ্যি করছিস ? তোদের বাড়িটা দেখছি একেবারে বদ্ধ পাগলের বাড়ি, আমি তো কখনও কোনও বাড়িতে এ-রকম কাণ্ড দেখিনি।

কল্যাণী বললে—এই যে দেখছো টি. ভি., এই যে দেখছো ট্রানজিস্টার, এই যে দেখছো রেকর্ডপ্লেয়ার, এ সমস্ত আমি তাগাদা দিয়ে তবে কিনিয়েছি। এবার একটা 'ভি. সি. আর' কেনবার কথা বলেছিলুম, তা কিছুতেই তোমার ভগ্নীপতি রাজী হয়নি।

—কেন ? তা কিনতে আপত্তি কী ?

কল্যাণী বললে—উনি বলেন ও-সব নাকি বিলাসিতা। উনি একদিনও টি. ভি দেখেননি, জানো ? টি. ভি আছে বলে আজ পর্যন্ত এ-ঘরেই উনি ঢোকেন না।

সুবোধ বললে—সত্যিই আশ্চর্য। তা তুই কী করবি?

কল্যাণী বললে—ও আমি কিনবোই, কিনে ছাড়বো। আমি সব মতলোব ঠিক করে ফেলেছি—দেখো।

—টাকা পাবি কোত্থেকে?

কল্যাণী বললে—ওঁর এক জুনিয়ার ছিল অংশুমান, চেনো তো? তার সঙ্গে কথা বলে আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি।

—কী ব্যবস্থা?

কল্যাণী বললে—ওই চাঁপার কথা তোমাকে বলেছি তো? ওই চাঁপাটাকে আগে এ-বাড়ি থেকে তাড়াবো, তবে আমার নাম।

সুবোধ বললে—কেন? ও কী করেছে?

—তুমি জানো না দাদা, তাই বলছ। শুনলে অবাক হয়ে যাবে তুমি। ওর জন্যে শাড়ি কিনে দেবার বেলায় তোমার ভগ্নীপতির টাকার অভাব হয় না—ওর জুতো কেনবার সময়ও তোমার ভগ্নীপতির টাকার অভাব হয় না।

সুবোধ নিজে ছাপোষা মানুষ। সে নিজে কখনও বেশি টাকার মুখ দেখেনি। কোনও রকমে টেনে-টুনে সংসার চালায়। অত কষ্টে বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে অফিসে ধার হয়ে গিয়েছিল—তার টাকা এখনও মাসে মাসে মাইনে থেকে কাটা যাচ্ছে। সেই ভগ্নীপতি এখন জজ হয়েছে, তার বোন জজের বউ হয়েছে, তার পক্ষে এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে? খবরটা শুনেও আনন্দ, শুনিয়েও আনন্দ।

কিন্তু তার বাড়িতেও যে এত সমস্যা তা সে কিছুতেই কল্পনা করতে পারেনি।

যাওয়ার সময়ে বললে—জানিস, তোর যখন বিয়ে দিয়েছিলুম তখন ভেবেছিলুম তোর জীবনে আর কোনও দুঃখ থাকবে না। কিন্তু এখন দেখছি অন্য রকম—আমরা সবাই-ই দেখছি টাকা-টাকা-টাকা করে হা-পিত্যেশ করে মরছি।

কল্যাণী বললে—কিন্তু এ-বাড়িতে তো তা নয়, এখানে টাকা থেকেও যে টাকা নেই।

সুবোধ বললে—ওরে, কথাটা একই হলো। আমি ভাবতুম টাকা না থাকলেই বুঝি যত জ্বালা। এখন দেখছি টাকা থাকাটাও কম জ্বালা নয়।

এর পর সুবোধ আর দাঁড়ালো না। কল্যাণীর বাড়ির সামনের রাস্তায় পা বাড়ালো। মনে মনে ভাবতে লাগলো—এদের মত বড়লোকদের কিনা এত টাকার সমস্যা!



অনিন্দ্য সেন বিচারক হওয়ার পর থেকেই ভাগবত আর্দালী বাড়ির কাজ-কর্ম সবই নিজের হাতে করতে লাগলো। অংশুমানের চেনা বিশ্বাসী লোক ভাগবত।

কল্যাণীর কথাতেই অংশুমান লোকটাকে দিয়েছিল।

কল্যাণী বলেছিল—এমন একটা লোক দেবেন আপনি যে বাড়ির সব কাজ করবে। হাট বাজার করা, রেশন আনা থেকে আরম্ভ করে রান্না-বান্না পর্যন্ত সব কাজ একা সামলাতে পারবে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব বিশ্বাসী হয়।

সে রকম লোক অংশুমানের হাতে ছিল। বলতে গেলে অংশুমানই অনিন্দ্য সেনকে বলে ভাগবতকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিল। শর্ত ছিল যে দরকার হলে সে ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম করবে।

তাই সে আসার পর থেকে চাঁপাকে আর কোনও কাজ করতে হয় না।

ইলেকট্রিকের বিল এসেছে। ঠিক তারিখে ইলেকট্রিক অফিসে গিয়ে বিলের টাকা জমা দিতে হবে। করপোরেশনের তিন-মাস পরপর ট্যাক্সের টাকা সেই অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে। তারপর আছে সাপ্তাহিক রেশন আনা। আর কিছু না নেওয়া হোক চিনিটা নিলেও কিছু টাকা বাঁচে! তা-ই বা ছাড়া কেন? তার পরেও কিছু খুচরো কাজের চাপ সব সংসারেই থাকে।

সে কাজগুলো এতদিন একলা চাঁপাই করে এসেছে। এ ছাড়া গৃহস্থের দৈনন্দিন রান্না-বান্নার কাজ তো আছেই, সেটা সারা মাস ধরেই আছে। কোর্টের ছুটি থাক আর না থাক রাবণের চিতা তো জ্বলতেই থাকবে।

সুতরাং…

সুতরাং ভাগবত যখন সারাদিন থাকবে খাবে, তখন চাঁপার জন্যে অত বাড়তি খরচ কেন করা? মাইনেটাই বা তাকে কেন দেওয়া? কালিদাসী এককালে এ-সংসারের অনেক উপকার করেছে বলে তার মেয়েকেও সারা জীবন মাইনে দিতে হবে, তাকে পুষতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তা ছাড়া তারও বিয়ের বয়েস হয়ে গিয়েছে। পরে হয়ত তার জন্যে একটা পাত্র খোঁজবার দায়ও এই সংসারের ঘাড়ে চাপবে। তার চেয়ে এখন থেকেই তাকে কোথাও সরিয়ে দেওয়া ভালো।

কথাটা কল্যাণী একদিন তুললো অনিন্দ্য সেনের কানে।

অনিন্দ্য সব কথাটা শুনে বললে—সে-কাজটা কি ভালো হবে?

কল্যাণী বললে—কেন ভালো হবে না?

অনিন্দ্য বললে—বাড়িতে থাক না ও। ওকে বাড়িতে রাখলে আর কীই বা এমন খরচ হবে? এতদিন ওর মা এ-বাড়ির জন্যে কত কাজ করেছে, আমাদের কত উপকার করেছে। সে-কথাটা যদি আমরা এখন ভুলে যাই তো সেটা মহা অকৃতজ্ঞতার কাজ হবে।

কল্যাণী বললে—কিন্তু বরাবর তো ওকে বাড়িতে রাখা যাবে না। পুরুষ মানুষ হলে না হয় রাখা যেত, কিন্তু ও তো মেয়ে! একদিন ওর বিয়ে দেওয়ার দায়ও তো আমাদের ঘাড়ের ওপর পড়বে! তখন?

অনিন্দ্য বললে—তখন বিয়ে দেব ওর।

কল্যাণী বললে—কার-না-কার মেয়ে, শুধু-মুধু কেন ওর বিয়ে দিতে যাবো আমরা? মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি চারটিখানি কথা?

অনিন্দ্য বললে—আমার নিজের ছোট বোন থাকলেও তো তার একটা বিয়ে দিতে হতো! মনে করে নাও না চাঁপা আমার নিজের মায়ের পেটের বোন।

কল্যাণী বললে—তা কী করে মনে করবো?

অনিন্দ্য বললে—মনে করে নিতে দোষটা কী? তা যদি মনে না করতে পারো তো ওকে বাপ-মা-মরা একটা গরীব আত্মীয়ের মেয়ে বলেও তো ধরে নিতে পারো।

কল্যাণী এবার জেদ ধরে বসলো। বললো—যা নয় তা আমি মনে করে নেব কী করে? আসলে ও তো ঝি-এর মেয়ে।

অনিন্দ্য বললে—তুমি তো বড় জেদী দেখছি।

কল্যাণী বললে—তুমি আমাকে জেদী বললে? জেদ্-করছি আমি কা'র জন্যে? তোমার সংসার, তোমার টাকা। এতে আমার কী স্বার্থ? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। একটা বাড়তি লোকের খাওয়া-পরা-থাকার খরচ কি কম? তোমার মেহনত করা টাকা যাতে এই ভাবে নষ্ট না হয়, এই জন্যেই তো এত কথা বলা। আমি বলছি এই বেলাই ওকে সরিয়ে দাও, নইলে শেষকালে ওর জন্যে আমাদের অনেক বদনাম হবে।

—কী বদনাম হবে মনে করো?

কল্যাণী বললে—আইবুড়ো ধাড়ি মেয়েকে বাড়িতে পুষে রাখলে যে-বদনাম হওয়া সম্ভব সেই বদনামই হবে! তুমি এতদিন ধরে কোর্টে রয়েছ, তুমি জানো না-কী বদনাম হয় এ-সব ক্ষেত্রে?

কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এত-কথা বলবার সময় থাকে না অনিন্দ্য সেনের হাতে। আগে যখন সে এ্যাড্ভোকেট ছিল তখন থাকতো ক্লায়েন্টরা। তারাই দিন-রাত্রের সময়টা নিয়ে নিত। রাত্রেই কিছুটা সময় পেত কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলবার। তাও তখন অনেক রাত হয়ে যেত। তখন তার সারা দিনের ক্লান্তির পর ঘুমও পেত খুব!

আর এখন?

একজন স্টেনো-টাইপিস্ট আসে কোর্টের পর। তাকে ডিকটেশন দিতে দিতে

অনেক সময়ে রাত একটাও বেজে যায়। তখন সেই টাইপিস্ট বেচারী আর বাড়ি যেতে পারে না। অনিন্দ্য সেনের বাড়ির একটা ঘরে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

আর শুধু যে অনেক রাত হয় তাই-ই নয়। ভোর চারটের সময় উঠেও অনেক সময় তাকে ডাকতে হয়—ডিক্‌টেশান নেওয়ার জন্যে।

শেষকালে একটা ঘরও দিতে হলো কার্তিককে। কার্তিক অধিকারী। দিনের বেলা সে অন্য জায়গায় চাকরি করে। সেখান থেকে আলাদা মাইনে পায় সে। আর জজ-সাহেবের কাছ থেকে যে মাইনেটা পায় সেটা ভোর চারটে থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত আর রাত আটটা থেকে মাঝ-রাত বারোটা একটা পর্যন্ত কাজের বাবদ্‌। সুতরাং সে সকালে রাতে দুবেলা অনিন্দ্য সেনের বাড়িতেই খায়, অনিন্দ্য সেনের বাড়িতেই একটা বাড়তি ঘরে শোয়।

মুশকিল হলো চাঁপার। তার ঘরটা কার্তিক অধিকারীকে ছেড়ে দিতে হলো। এককালে কালিদাসী আর চাঁপা সেই ঘরটাতেই শুতো। সেটা ছিল তাদের অধিকারে।

সত্যিই তো, চাঁপা এখন কোথায় যায়?

কল্যাণী শাশুড়ীকে বললে—চাঁপা এখন কোথায় শোবে?

কথাটা ভাববার মত। সুভদ্রা বললে—সে তাহলে আমার ঘরেই আপাততঃ শুক্‌।

—তাতে আপনার অসুবিধে হবে না?

সুভদ্রা বললে—আমার অসুবিধে হলেই বা কী করছি। কোনও একটা ঘরে তো ওকে শুতে দিতে হবে।

কল্যাণী বললে—সেই জন্যে তো আপনার ছেলেকে বলেছিলুম ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে।

—অন্য কোথাও পাঠাবে ওকে? ওর তো আপন-জন বলতে কেউ নেই এখানে।

কল্যাণী বললে—এমন অনেক বাড়ি আছে যাদের বাড়িতে ঝি নেই। তারা চাঁপাকে পেলে এখুনি লুফে নেবে।

সুভদ্রা তখনও একটু দ্বিধা করতে লাগলো মনে মনে।

বললে—আমাদের বিপদের সময়ে ওরা মা-মেয়ে আমাদের অনেক করেছে। এখন ওকে বাড়ি-ছাড়া করবো?

কল্যাণী বললে—চাঁপারও তো বয়েস হচ্ছে, চিরকাল তো আর আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে পুষে রাখা যাবে না। একদিন তো ওর বিয়েও দিতে হবে।

সুভদ্রা কল্যাণীর কথায় সায় দিলে। বললে—তা দিতে হলে দিতে হবে।

কল্যাণী বললে—আজকালকার মাগ্‌গী-গণ্ডার বাজারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি চারটিখানি কথা?

সুভদ্রা বললে—তা হলেই বা। জিনিস-পত্তোরের দাম বাড়লেও কারোর কোনও কাজ কি কিছু আটকে থাকছে? আগেও লোকে যা খেতো, এখনও তাই-ই খাচ্ছে।

আলু-পটলের দাম বেড়েছে বলে কি লোকে আলু-পটল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে? না চালের দাম বেড়েছে বলে লোকে ভাত খাওয়া বন্ধ করেছে।

শাশুড়ীর কথায় নিজের কথার সমর্থন না পেয়ে কল্যাণী মনে মনে আরো কঠোর হয়ে উঠলো।

স্বামীও তার কথা শোনে না, শাশুড়ীও শোনে না তার কথা। তাহলে সে কী করবে? কার দ্বারস্থ সে হবে?

সেদিনও চরণ দাস বাবাজী যথারীতি বাড়িতে এল। তার সেই গান আরম্ভ করতেই কল্যাণী নিজে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

চরণ দাস বাবাজী তখন তার চিরাচরিত গান ধরতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই কল্যাণী গিয়ে হাজির হলো তার সামনে।

চরণ দাস কল্যাণীকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল।

বললে—একি, বউদিদিমণি, আপনি? আমার মা-জননী কোথায়?

কল্যাণী বললে—একটা কথা আছে বাবাজী আপনার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে কী কথা বউদিদিমণি?

কল্যাণী বললে—আগে বলুন বাবাজী, আমি যা বলবো তা কাউকে বলবেন না?

চরণ দাস বললে—কেন বউদিদিমণি? কী এমন কথা যে কাউকে বলা যাবে না?

কল্যাণী বললে—আমার নিজের ভালোর জন্যেই বলছি বাবাজী। আমি বড় কষ্টে আছি বাবাজী, আমি আর পারছি না। আমাকে আপনি বাঁচান!

—সে কী বউদিদিমণি, আমি আপনাকে বাঁচাবার কে? বাঁচাবার মালিক তো আমি নই বউদিদিমণি! মালিক তো সেই উনি—

বলে ডান হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলে।

কল্যাণী বললে—না বাবাজী আপনার যিনি মালিক, আমারও মালিক সেই তিনিই। তবু সেই মালিক তো নিজের হাতে কিছু করেন না, আমাদের দিয়েই সব কাজ করান।

—তা বলুন না বউদিদিমণি, কী কাজ আমাকে করতে হবে, কী কাজ করলে আপনার কষ্ট দূর হবে?

এবার একেবারে স্পষ্ট করে কল্যাণী বললে—চাঁপার ভার আপনাকে নিতে হবে।

—আমাকে চাঁপার ভার নিতে হবে? আমি গরীব ভক্ত, চাঁপার ভার আমি নেব কী করে? আমার না আছে পাকা বাড়ি, না আছে একখানা ভালো ঘর। আমিই বা খাবো কী আর সে-ই বা কী খাবে?

কল্যাণী বললে—সে-ভাবনা আপনাকে করতে হবে না বাবাজী, সে-ভাবনা আমার।

চরণ দাস হাসলো। বললে—আমাকে কি পরীক্ষা করছেন বউদিদিমণি? জানিনা প্রভু আমাকে আবার কোন্ ছলনার মধ্যে ফেলছেন। আমি তো চিরকাল সংসার-ত্যাগী মানুষ, সংসারে তো আমার আর কোনও আকর্ষণই নেই!

কল্যাণী বললে—না না, সংসার করতে তো আমি বলছি না আপনাকে। সে আপনার কাছে আপনার মেয়ে হয়ে থাকবে। বাপের কাছে কি মেয়ে থাকে না?

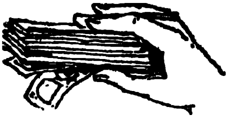
চরণ দাস বললে—কিন্তু বউদিদিমণি, আমার যে চাল-চুলো কিছুই নেই—ভিক্ষেই যে আমার একমাত্র আশ্রয়, ভিক্ষে করে প্রভুকেই বা কী সেবা দেব আর আমার মেয়েকেই বা কী খাওয়াব?

কল্যাণী অন্য দিনের মত চাল আর গণ্ডা-চারেক পয়সা চরণ দাসকে দিয়ে বললে—আমার কথাটা একবার ভাবুন আপনি বাবাজী, বাড়ি গিয়ে বেশ ভালো করে ভাবুন, এখনই কথা দিতে হবে না। আপনার যা খরচা-পাতি লাগে তা সমস্তই আমি দেব আপনাকে, খাওয়া-পরা-থাকার খরচা সমস্ত আমিই দেব বাবাজী, আপনার কোনও ভাবনা রাখবো না আমি, এই আমি কথা দিলাম আপনাকে। মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা আপনাদের দু'জনের যা খরচ লাগে তা সব দেব আমি। তার থেকে বেশি লাগলে তাও আমি দেব। আপনি বাড়ি গিয়ে বেশ ভালো করে ভাবুন গিয়ে, তারপর কী ভাবলেন তা কালকে এই সময়ে আমাকে এসে বলবেন।

চরণ দাস বাবাজী আর কী বলবে এত কথার পর। অন্য দিনের মত সেদিন আর তার গলা দিয়ে নাম-গান বেরোল না।

কল্যাণী দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে এলো। ভাগবত তখন রোজকার মতো রান্না করতে ব্যস্ত। সাহেব এখনই কোর্টে যাবেন। তাঁকে ঠিক সময়ে খাবার দিতে হবে। টাইপিস্টবাবুকে তখনও তিনি নোট দিয়ে যাচ্ছেন। জরুরী ডিক্টেশান। রায়ের মধ্যে কোনও ত্রুটি না থাকে। ত্রুটি থাকলেই মামলা যাবে দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টে। সেখানে সব মামলার সুবিচার হয়—এইটেই লোকের ধারণা। কিন্তু আজ পর্যন্ত অনিন্দ্য সেনের কোনও মামলার রায় সেখান থেকে অগ্রাহ্য হয়ে ফিরে এসেছে, এমন নজির অনিন্দ্য সেনের জীবনের ইতিহাসে নেই।

টাইপিস্ট কার্তিক অধিকারী মন দিয়ে ডিক্টেশান নিয়েছিল। অনিন্দ্য সেন সমস্ত রায়টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। তারপর সব দেখে শুনে যখন বুঝলেন যে তাঁর রায়ে কোনও ভুল নেই, তখন তাতে সই দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।



তখনও মানুষ অনিন্দ্য সেন স্থাণুর মত একমনে তাঁর স্বীকারোক্তি করে চলেছেন। মহামান্য আদালতের ঘরের ভেতরে তখনও ডিফেনডেণ্ট অ্যাড্‌ভোকেট অংশুমান ঘোষ আর প্লেনটিভ্‌-এর অ্যাড্‌ভোকেট সুনীল সান্যাল মন্ত্রমুগ্ধের মত অনিন্দ্য সেনের স্বীকারোক্তি শুনে চলেছে। তাদের সঙ্গে 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোমে'র মালিক ডাক্তার পরমার্থ বোসও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে ফরিয়াদী চরণ দাস বাবাজী আর তার পাশে সুবোধ। কল্যাণী সেনের ভাই—সুবোধ। সে যত শুনছে ততই আরো স্বীকারোক্তি শোনবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বেঞ্চ-ক্লার্ক তারাপদ চ্যাটার্জি বউ এর কাছে বরাবর হাকিমদের নির্লিপ্ততা নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যে-কাণ্ড ঘটছে তা দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে জজ-সাহেবের মুখের প্রত্যেকটি শব্দ একমনে গিলছে। মহামান্য আদালতের ইতিহাসে তো আগে কখনও এ-রকম ঘটনা ঘটেনি, আর ভবিষ্যতেও যে কখনও ঘটবে এমন কল্পনা করতেও তার অভিজ্ঞতায় বাধছে!

অনিন্দ্য সেন বলে চলেছেন—আমি সারা জীবন ন্যায়ের পক্ষে, সুবিচারের পক্ষে রায় দিয়ে এসেছি। যখন এই আদালতে আমি অ্যাড্‌ভোকেট ছিলাম তখনও সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে শুধু ন্যায়ের পক্ষেই আমি সংগ্রাম করেছি, এখন বিচারক হয়েও আমি সেই পথই জীবনের শ্রেষ্ঠপথ বলে বিচার করেছি। অর্থের লোভ, খ্যাতির লালসা আমাকে কখনও বিপথে নিয়ে যেতে পারেনি। আমি কেবল একটা জিনিসই জীবনে কামনা করে এসেছি যে মানুষ সুখী হোক, মানুষ সৎ হোক, মানুষ মানুষ হোক। আমি চেয়েছি মানুষ নিজেকে জানুক। কারণ নিজেকে জানলেই মানুষ নিজের চেয়ে যে বড় তাকে চিনতে পারবে। যীশুখৃষ্টের জন্মের চারশো নিরানব্বুই বছর আগে সোক্রেটিস যে-কথা বলার জন্যে মাথা পেতে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন আমি সেই কথাই মানুষের প্রথম এবং শেষ কথা বলে মনে করে এসেছি।

কিন্তু আমি যা চেয়েছিলুম তা হয়নি। পৃথিবী যেদিকে চললে আমি খুশী হতুম সেদিকে পৃথিবী চলেনি। সেইটেই ছিল আমার চরম দুঃখ আর চরম দুশ্চিন্তা। বাবা আমাকে তাঁর অফিসে আড়াই হাজার টাকার একটা চাকরি নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভেবেছি আমি টাকা নিয়ে কী করবো, তার চেয়ে কম টাকা পেয়ে মানুষের সেবা করাটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় আদর্শ বলে মনে করে এসেছিলাম। এর মূল কারণ ছোটবেলায় আমার গৃহ-শিক্ষক মোহাম্মদ আশিফ সাহেব আমাকে একটা

বই উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। বইটার নাম ছিল 'MAN'। সেই বইটি পড়াবার পর থেকেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পথটা বেছে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি। আর তখন থেকেই আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, যে ভাবে জীবন কাটিয়েছি, যা-কিছু ভেবেছি সমস্ত সেই আদর্শের অনুকূলে। তখন ভাবিনি যে আমার নিজের মধ্যেই আমার ধ্বংসের বীজ বোনা রয়েছে, আমার নিজের বাড়িতেই আমার শত্রুকে ভরণ-পোষণ করে আসছি।

একদিন হঠাৎ আমার খেয়াল হলো—বাড়িতে কালিদাসীর মেয়ে চাঁপা ছিল, তাকে দেখছি না কেন? সে কোথায় গেল?

ছোটবেলা থেকে এই বাড়িতে মানুষ হয়েছি। সে যখন ছ'মাসের মেয়ে আমি তখন দশ বছর বয়েসে পড়েছি। তারপর আমিও বড় হয়েছি, সেও বড় হয়েছে। সে আমার কাছে, আমার বাবার কাছে, আমার মা'র কাছে আবদার করেছে। সে ভেবে নিয়েছে যে আমাদের বাড়িটা তারই বাড়ি, আমার মা-ই তার মা, আমার বাবাই তার বাবা। যেমন ভাবে ছোট বোন তার দাদার কাছে চকোলেট খাবার জন্যে আবদার করে, আচার খাবার জন্যে আবদার করে, ফ্রক কেনার জন্যে আবদার করে, চাঁপাও তাই করতো। পুজোর সময়ে যখন আমাদের সকলের জন্যে নতুন জামা-কাপড় কেনা হতো, তেমনি চাঁপার জন্যেও তাই কেনা হতো। সে যে অন্য বাড়ির মেয়ে, সে যে আমাদের নয়, সে যে পর, তা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিশেষ করে কালিদাসীর মৃত্যুর পর সে যেন আমাদের আরো পরম এবং আরো নিকট আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল।

মা'কে জিজ্ঞেস করলাম—মা, চাঁপা কোথায় গেল? চাঁপাকে যে বাড়িতে দেখছি না?

আমার যেমন কোর্টে এলে বাড়ির কথা ভাববার সময়ই থাকে না, তেমনি বাড়িতে গিয়েও যে বাড়ির কথা ভাববো, তারও সময় থাকে না। বাড়িতে গিয়েও আমি রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে কোর্টের কাজ নিয়ে বসে আমার স্টেনো-টাইপিস্ট কার্তিককে ডিক্‌টেশান দিই, তারপরে আবার কোর্ট থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত স্টেনোকে ডিক্‌টেশান দিতে দিতেই সময় কেটে যায়। নিজের বাড়ির দিকে নজর দেওয়ার সময় বা অবসর থাকে না।

মা'কে আবার একদিন জিজ্ঞেস করলাম—মা, চাঁপা কোথায় গেল? চাঁপাকে বাড়িতে দেখছি না যে?

উত্তর পেলুম—চাঁপা তো নেই। তুই কিছু জানিস না? বউমা তোকে কিছু বলেনি?

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—কেন? বউমা আমাকে কি বলবে?

মা বললে—চাঁপাকে তো চরণ দাস বাবাজী নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে রে।

—সে কী?

মা বললে—হ্যাঁ, এ-বাড়িতে তার শোবার ঘর ছিল না। তোর টাইপিস্ট্‌বাবু তো চাঁপার ঘরে শোয়। তোর টাইপিস্ট্‌বাবু আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে চাঁপা আমার ঘরে শুতো। সে-ঘরে ওর শুতে ভালো লাগতো না, তাই চরণ দাস বাবাজীর বাড়িতে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—চরণ দাস বাবাজী নিজেই তো একজন গরীব লোক, ভিক্ষে করে খায়, চাঁপাকে রাখতে ওর খরচ লাগবে না?

মা বললে—চরণ দাসকে বলেছি ওর খরচা আমি দেব।

—কত খরচ দেবে?

মা বললে—খাওয়া-পরার জন্যে একজন মানুষের যা খরচ লাগে তা-ই দেব। তা ছাড়া আর তো কোনও উপায় ছিল না।

মা'র কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগলো। জন্ম থেকেই চাঁপা তার মা'র সঙ্গে আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে, দু'জনে মিলে এতকাল ধরে আমাদের আপ্রাণ সেবা করে এসেছে, তার মা কালিদাসী এ-বাড়িতেই তার জীবন ত্যাগ করেছে, আর ভাগবত আর্দালী আসবার পর থেকেই তাকে এমন করে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হলো? এ কী-রকম ব্যবহার, এ কী-রকম বিচার? আমি নিজে একজন বিচারক হয়ে এই-রকম অবিচার করবো? প্রয়োজনের সময় আমরা একজনকে আদর করবো আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাকে উচ্ছিষ্টের মত পরিত্যাগ করবো, এর নাম কি মনুষ্যত্ব?

সেদিন আর এ-ব্যাপার নিয়ে কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলবার সময় ছিল না। কার্তিককে একটা জরুরী কাজের জন্যে ডিক্‌টেশান দিতে হবে। সেই নিয়েই তখন রাত একটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হলো। তারপর কাজের শেষে যখন নিজের ঘরে শুতে গেলাম তখন দেখলুম কল্যাণী নিশ্চিত মনে নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। আমি তখন তাকে জাগিয়ে তার বিরক্তিভাজন হলাম না। অথচ তখন আমার চোখ দুটোও ঘুমের ঘোরে ঢুলতে আরম্ভ করেছে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই তো আবার রুটিন মাফিক কার্তিককে ডিক্‌টেশান দেবার পালা।

হাতে যা একটু সময় পেলাম সেইটুকুতেই কল্যাণীকে বললাম—চাঁপাকে চরণ দাস বাবাজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ, এ কথাটা তো আমাকে বলোনি?

কল্যাণী বললে—তোমার সঙ্গে দেখা হলে তো বলবো? তোমার সঙ্গে দিনের মধ্যে কতটুকুর জন্যেই বা দেখা হয় আমার?

—রবিবার সকাল বেলা তো বাড়িতে ছিলুম, তখনও তো বললে না?

কল্যাণী বললে—তুমি না হয় কাজের লোক কিন্তু আমার কাজও কি কম? এতগুলো লোক খাবে, তার ওপর তোমার টাইপিস্টবাবুর খাওয়া, সবলের সব ব্যবস্থা তো একলা আমাকেই করতে হয়।

—তবু চাঁপাকে পরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে, এ খবরটা জানাতে আর ক'মিনিট সময় লাগে?

কল্যাণী বললে—সময় লাগার কথা নয়, কিন্তু মাথার মধ্যে ভাবনাটা? ভাবতে তো হয় সেই একলা আমাকেই। ভাগবত তো বাজার করবে, রান্না করবে, সব কাজই না হয় করবে। সেই কাজ করেই সে খালাস, কিন্তু কোন কাজটা সে কখন করবে, কী কী বাজার থেকে আনবে, সে-সব ভাবনা তো আমার।

অত কথা বলবার সময় আমার তখন ছিল না। তবু বললাম—যা হোক, চরণ দাস যে তাকে খাওয়াবে, তারও তো একটা খরচ আছে। সে গরীব লোক, টাকা কোথায় পাবে?

কল্যাণী বললে—তুমি কি ভাবছো আমি সে-কথা ভাবিনি? আমি চরণ দাস বাবাজীকে বলে দিয়েছি যে চাঁপার খরচা-পাতির জন্যে তাকে ভাবতে হবে না, আমি তাকে মাসে ষাট টাকা করে দেব।

—ষাট টাকায় তার কী করে চলবে? আজকাল ষাট টাকায় কি একটা মানুষের খাওয়া-পরা চলে?

কল্যাণী বললে—যদি বেশি পড়ে তো আমি বলে দিয়েছি যে আমার কাছে চাইলে আমি না-হয় আরো পাঁচ-ছ'টাকা দেব।

কথাটা আমার ভালো লাগলো না। কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করবার মত সময় তখন আমার হাতে ছিল না। আমি তখন আমার চেম্বারে চলে গেলাম। জরুরী কাজ ছিল কার্তিককে নিয়ে। সেদিন একটা মামলার রায় দেবার কথা।

দু'শো বছর আগেও এমনি ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সের রাজধানীতে ল্যাভোজি'য়ার ল্যাবোরেটারিতে। সেদিনও তাঁর কাছে একজন এসে বলেছিল—কই, আপনি কিছু ভেবেছেন আমাদের ব্যাপারে?

ল্যাভোজি'য়া জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপারে?

লোকটা বললে—সেই যে আপনাকে মহারাণী বিষ আবিষ্কার করতে বলেছিলেন? আপনাকে আমি মহারাণীর নির্দেশের কথা জানিয়েছিলাম। আপনি কিছু ভেবেছেন?

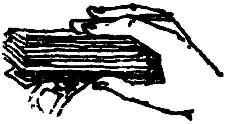
ল্যাভোজি'য়া বললেন—সে-ব্যাপারে আমি আর কী ভাববো?

—তাহলে কি আপনি মহারাণীর নির্দেশ মানবেন না?

ল্যাভোজি'য়া বললেন—না, আমি তো বলেই দিয়েছি আমি বিষ আবিষ্কার করবো না।

—করবেন না?

—না।



সেদিন দুপুর বেলাই অংশুমান ঘোষ ডাক্তার পরমার্থ বোসকে নিয়ে কল্যাণীর কাছে এলো। 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোমে'র মালিক ডাক্তার পরমার্থ বোসের কথা কল্যাণী অনেক শুনেছে অংশুমানের কাছে। এই 'নার্সিং-হোমে' অংশুমানের শেয়ার আছে। ডাক্তার পরমার্থ বোসের দৈনিক আয় দু'হাজার থেকে নাকি কোনও কোনও দিন দশ হাজার টাকাও হয়। সে-কথাও কল্যাণী অনেকবার শুনেছে।

অংশুমান এই পরমার্থ বোসের কথা, তার অগাধ টাকা উপায়ের কথা, তার ভদ্র ব্যবহারের কথাও বলেছে। টাকা উপায়ের এত সহজ রাস্তা থাকতে কেন মানুষ ওকালতি করে, কেন মানুষ জজিয়তি করে, কেন মানুষ লোহালক্কড়ের ব্যবসা করে, কেন ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করে—এ কথা ভেবে কল্যাণী অনেকবার অবাকও হয়েছে। তার যদি অনেক টাকা থাকতো তা হলে কি এই গলির মধ্যে এমনি ছোট বাড়িতে সে থাকতো। এ-বাড়িতে হাওয়া ঢোকে না, রোদ ঢোকে না। এ-বাড়ি থেকে আকাশ দেখা যায় না, এ-বাড়ি থেকে রাস্তার মানুষ দেখা যায় না। টাকা থাকলে বড় রাস্তার ওপর একটা বাগানওয়ালা বাড়ি করতো সে। কিন্তু ওই মানুষটা তো সে-কথা বুঝবে না, সে-কথা শুনবে না, শুনতে চাইবেও না। আর ও-সব বাজে কথা শোনবার সময়ই হয় না তার।

যে-সময়ে পরমার্থ বোসকে নিয়ে আসবার কথা ছিল ঠিক সেই সময়েই অংশুমান তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। কল্যাণী তৈরিই ছিল। ভাগবতকে দিয়ে তাদের জন্যে চা জলখাবারের বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়েছিল।

ভাগবতকে কল্যাণী বলে দিলে তাকে আর এ-ঘরে আসতে হবে না।

ভাগবত চলে যেতেই কল্যাণী ঘরের ভেতরের বাইরের দুটো দরজা বন্ধ করে দিলে।

পরমার্থ বললে—অংশুমান আমাকে আপনার কথা অনেক বলেছে।

অংশুমানও সঙ্গে সঙ্গে বললে—হ্যাঁ বউদি, আপনি আমাকে যা-যা বলতে বলেছিলেন, আমি সব বলেছি পরমার্থকে।

পরমার্থ বললে—আপনি বলুন আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

কল্যাণী বললে—আমি যা চাই তা সমস্তই আমি অংশুমানকে বলেছি।

পরমার্থ বললে—আপনার বড় রাস্তার ওপর একটা বাড়ি চাই তো?

—হ্যাঁ। আর এ-বাড়িতে একটা ঝি ছিল, তার নাম চাঁপা। তাকে আমি এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

—কোথায় তাড়িয়ে দিয়েছেন?

—একজন বুড়ো মানুষ আমাদের বাড়িতে রোজ ভিক্ষে করতে আসতো, তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি তার খাওয়া-পরার জন্যে আমি তাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেব। আর যদি কখনও বিশেষ দরকার হয় তো দু'দশ টাকা আরো না-হয় দেব।

পরমার্থ বোস বললে—ভালোই করেছেন, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

অংশুমান বললে—এইবার তুমি বউদিকে সেই কথাটা বলো? যে কথাটা তুমি বলছিলে।

পরমার্থ বোস বললে—হ্যাঁ, একটা কাজ করলে আপনি যা-যা চাইছেন সমস্তই পেয়ে যাবেন। আর তাতে আপনার অনেক টাকা আয়ও হবে।

—বলুন না, কী কাজ?

পরমার্থ বললে—মিস্টার সেনকে কিন্তু সে-ব্যাপারে আপনাকে রাজি করাতে হবে। সেটা আপনি পারবেন?

কল্যাণী বলল—বলুন, কী করতে হবে আমাকে? কোন্ ব্যাপারে মিস্টার সেনকে রাজি করাতে হবে?

পরমার্থ বললে—এই অংশুমান তো এখন আর মিস্টার সেন-এর জুনিয়ার নয়। অংশুমান এখন নিজেই সিনীয়ার অ্যাডভোকেট হয়ে গেছে। আপনি শুধু মিস্টার সেনকে বলে দেবেন ওঁর কাছে অংশুমান যে-ব্রিফ্ নিয়ে দাঁড়াবে তিনি যেন তার ফেভারে জাজমেন্ট্ দেন।

অংশুমান কল্যাণীকে বললে—আপনি কথাটা বুঝলেন বউদি?

কল্যাণী বললে—বুঝেছি।

পরমার্থ বোস আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন। এটা খুব শক্ত কাজ নয়। যদি এ-কাজটা করতে পারেন তো আপনি যা চাইবেন তা-ই পাবেন।

কল্যাণী কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। সে যা চাইবে, তা কী করে পাবে? সে কি ভালো একটা বাড়ি পাবে?

অংশুমান কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে স্পষ্ট করে বললে—শুধু বাড়ি নয় বউদি, আপনি যদি আপনার ঘরটা এয়ার-কন্ডিশন করে নিতে চান, তাও করতে পারবেন, ইচ্ছে হলে একটা নতুন গাড়িও পাবেন।

—কী করে তা করতে পারবো? অত টাকা আমি কোথায় পাবো?

পরমার্থ বোস বললে—টাকার ভার আমি নেব। যত টাকা আপনি চান তা আমি

আপনাকে দেব। মাসে কত টাকা আপনি চান বলুন? তিন হাজার টাকা? পাঁচ হাজার টাকা? দশ হাজার টাকা? শুধু বলে দিন কত টাকা হলে আপনার চলে? সে-ভার আমি নেব। আপনি শুধু মিস্টার সেনকে বলে রাজি করিয়ে দেবেন যে অংশুমানের পক্ষে যেন উনি জাজমেন্টগুলো দেন।

—তাতে কী হবে?

পরমার্থ বোস বললে—তাতে এই লাভ হবে যে দিন-দিন অংশুমানের প্র্যাক্‌টিশ বাড়বে, অংশুমান নিজের ফিজটা ডবল, তিন ডবল করে বাড়িয়ে নেবে। কারণ তখন পাবলিক বুঝতে পারবে যে অনিন্দ্য সেনের এজলাসে কেস উঠলে অংশুমানকে ব্রীফ দিলে তাদের জয় অনিবার্য।

কল্যাণী কথাগুলো শুনে কী বলবে বুঝতে পারলে না।

অংশুমান বললে—আপনি অত কী ভাবছেন বউদি? অত ভাববার কী আছে?

কল্যাণী বললে—তোমার ফীজ্ বাড়ার সঙ্গে আমার টাকা হওয়ার কী সম্পর্ক তা আমি বুঝতে পারছি না।

অংশুমান পরমার্থ বোসকে বললে—ভাই, বউদিকে তুমিই বোঝাতে পারবে, তুমিই ব্যাপারটা বউদিকে বুঝিয়ে দাও।

পরমার্থ বললে—ওর প্র্যাক্‌টিশ বাড়লে আপনার কী করে টাকা হবে তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। অংশুমান আমার ফ্রেন্ড. অংশুমানের প্র্যাক্‌টিশ বাড়লে ও আমার নার্সিং হোমের আরো অনেক শেয়ার কিনবে। আমি সেই টাকায় আমার নার্সিং হোমটা আরো বাড়াবো। আমার আরও ইনকাম বাড়বে। আমি নার্সিং হোমের আরো অনেক ব্রাঞ্চ খুলবো কলকাতায়। অংশুমানের শেয়ারের ফিফ্‌টি পার্সেন্ট প্রফিট আপনি পাবেন।

কল্যাণী বললে—কত টাকার মত সেটা হবে মাসে?

অংশুমান বললে—তা কম করে মাসে পাঁচ হাজারের মত তো হবেই। আমি যা পাবো তার অর্ধেক আপনি পাবেন। আমি যদি পাই দশ হাজার, তার অর্ধেক আপনি পাবেন।

পরমার্থ বললে—প্রথম প্রথম কম পেলেও ক্রমেই সেটা বেড়ে যাবে। বছর দুয়েকের মধ্যে পাঁচ হাজার থেকে বেড়ে সেটা দশ হাজার পনেরো হাজারে গিয়েও দাঁড়াতে পারে। সবই মিস্টার সেনের ওপর নির্ভর করছে। এখন তাঁকে রাজি করানোর ভার আপনার ওপর। আজকাল টাকা উপায় করতে এর চেয়ে সহজ রাস্তা আর কোনও লাইনে নেই।

বলে ওঠবার চেষ্টা করলে। ডাক্তার পরমার্থ বোস ব্যস্ত মানুষ। কোথাও কোনও জায়গায় গিয়ে বসে গল্প করবার সময়ও তার নেই। তার গল্প করা মানেই টাকা লোকসান করা। তার নার্সিং হোমে দিনে কম করে কুড়িটা করে 'টার্মিনেশন অবৃ

প্রেগন্যান্সি' কেস থাকে। আগে এই রকম এক-একটা কেসে হাজার টাকা রেট বরাদ্দ ছিল। এখন হয়েছে দু'হাজার টাকা। এর কিছুদিন পরে কেস-পিছু তিন হাজার চার হাজার টাকা হবে। তখন প্রফিট আরো বেশি হবে। এ ছাড়াও আছে 'সিজারিয়ান ডেলিভারি' কেস। আগে তার রেট ছিল কেস পিছু পাঁচ হাজার টাকা, এখন হয়েছে দশ হাজার। আর কিছুদিন পরেই পনেরো হাজার টাকা হবে। আর সিজারিয়ান কেস তো ডাক্তার পরমার্থ বোসের নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। ডেলিভারি হবার আট ন'মাস আগে থেকেই পেশেণ্টরা আসে 'চেকিং' করাতে। তখন ডাক্তার পেশেণ্টদের দামী-দামী ওষুধ খেতে দেয়। উদ্দেশ্য ভাবী সন্তানদের স্বাস্থ্যবান করে তোলা। কিন্তু তারও তো একটা মাত্রা আছে। কিন্তু ডাক্তার পরমার্থ বোস ইচ্ছে করে মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে দেয় যাতে মায়ের পেটের ভ্রূণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান হয়, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ওজনের হয়। বেশি স্বাস্থ্যবান আর বেশি ওজনের সন্তান হলেই স্বাভাবিক প্রসবের বদলে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর সেই শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনটা অনিবার্য করে তোলাটা ডাক্তার পরমার্থ বোসের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে বলে তার নার্সিং-হোমে'র প্রফিটের অঙ্কটা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে।

আর শুধু কি তাই? ডাক্তার পরমার্থ বোসের অনেক মাইনে করা এজেণ্ট আছে। এজেণ্ট মানে দালাল।

সেই সব দালালদের কাজই হলো বড়-বড় লোকদের বাড়িতে আড্ডা মারা। কিংবা হাইকোর্টে বার-লাইব্রেরীতে গিয়ে এ্যাডভোকেটদের আর ব্যারিস্টারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা। কিংবা কলকাতার বড় বড় ক্লাবে—যেমন 'সাউথ ক্লাবে', কি 'ক্যালকাটা ক্লাব'-এর মেম্বার হওয়া আর ককটেল-পার্টি দেওয়া। সেখানকার মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তেমন কোনও প্রসঙ্গ উঠলেই 'লাইফ-কিওর-নার্সিং-হোমের' নামটা উল্লেখ করা। তখনই তারা বলবে—আরে, আপনি যাকে-তাকে দিয়ে ট্রিটমেণ্ট করাবেন না। যদি কখনও ডাক্তার দেখাতে হয় তো ডাক্তার পরমার্থ বোসকে একবার কল্ দিন।

তারা যদি জিজ্ঞেস করে—কে ডাক্তার পরমার্থ বোস?

দালালরা বলবে—সে কী, আপনি ডাক্তার পরমার্থ বোসের নামই শোনেন নি? ও-রকম ডাক্তার সারা ইণ্ডিয়াতে নেই—এই তো সেদিন আমার স্ত্রীকে ওঁর নার্সিং-হোমে ভর্তি করে দিলুম, আর এতদিন ধরে কলকাতার বড়-বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে যা হয়নি, তা-ই হয়ে গেল ডাক্তার পরমার্থ বোসকে দেখিয়ে। একেবারে পাঁচ দিনের মধ্যে কমপ্লিট কিওর—একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি মশাই, ধন্বন্তরি…

পরমার্থ বোসের এই রকম একশো, দেড়শো দালাল সারা কলকাতাময় ছড়ানো

আছে। তারা পরমার্থ বোসের কাছ থেকে মাইনে তো পায়ই, প্লাস কমিশনও পায় মোটা রকম।

তবে কিন্তু একটা ব্যাপারে পরমার্থ বোস খুব হুঁশিয়ার। হাইকোর্ট বা লোয়ার কোর্টের কোনও হাকিমের কাছে পরমার্থ বোস একেবারে উদার-হস্ত। তাদের কাছ থেকে পরমার্থ বোস জীবনে কখনও পয়সাই নেবে না। শুধু যে পয়সা নেবে না তাই নয়, উল্টে নানা জিনিস উপহার দেবে। যাঁর জন্ম-তারিখ জানা আছে তাঁকে তাঁর বার্থ-ডে-গিফট পাঠিয়ে দেবে। সময় পেলে নিজে গিয়ে 'উইশ' করে আসবে, কিংবা 'মেনি হ্যাপি রিটার্ণস' করে আসবে।

এ এক অব্যর্থ টিপ্‌। এই সব করেই পরমার্থ বোসের 'লাইফ-কিওর নার্সিং-হোমে'র এত রম-রমা! তার নার্সিং-হোমের ভেতরে গেলে বোঝা যাবে যে সেখানে গিয়ে পয়সা খরচ করা সত্যিই সার্থক। কলকাতার সরকারী বে-সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা দিন-দিন যত খারাপ হতে চলেছে পরমার্থ বোসের 'নার্সিং-হোমে'র আরাম আর আয় রমরমা করে ততই বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে।

আর, এর সঙ্গে অন্য আর একটা গুপ্ত আয়ও আছে পরমার্থ বোসের।

খুব চুপি চুপি বলছি এখানে। সেটা যেন আপনারা কাউকে বলবেন না।

যদি আপনারা কারো হাত থেকে মুক্তি পেতে চান তো তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে ডাক্তার পরমার্থ বোস। পরমার্থ বোস সত্যিই বড় পরপোকারী ডাক্তার। কারো কোনও দুঃখ সইতে পারে না। সত্যিই তো মানুষ এত রকমের কষ্ট পায় কেন? মানুষের এত রকমের দুঃখ-দৈন্য কেন? ভগবান যদি কাউকে পৃথিবীতে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন তো তাকে এত যন্ত্রণাই বা দেন কেন? ধরুন আপনি ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার পুত্রের শ্বশুর যা যৌতুক দেবেন বলেছিলেন, তা দেন নি। কথা ছিল, মেয়ের বিয়ের পর নগদ এক লাখ টাকা তিনি যৌতুক স্বরূপ দেবেন। চল্লিশ ভরি সোনার গয়না দিয়েছেন। তার সঙ্গে ফার্নিচার, কাঁসার এবং স্টেনলেস স্টীলের বাসন যা দেবার, তাও দিয়েছিলেন। পূর্বশর্ত মত নমস্কারী, টি-ভি, মারুতি গাড়ি সব-কিছু দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই আগেকার কথা অনুযায়ী এক লাখ টাকা যৌতুক যা দেবার ছিল, সেটা তিনি দেন নি বা দিতে পারেন নি। ধরুন, আপনি অনেক বার সেটা দেবার জন্যে পীড়াপীড়িও করেছেন। তিনি নানা বাহানা করে সেটা দিচ্ছেন না বা দিতে পারছেন না। তা নিয়ে আপনি আপনার বউমাকে দিয়ে অনেকবার অনেক কথাও শুনিয়েছেন। তার জন্যে বউমাকেও প্রকারান্তরে আপনি দেহকষ্ট ও মনকষ্ট দিয়েছেন অনেক। কড়া কথাও শুনিয়েছেন। আপনার ছেলেকে আমেরিকায় পাঠাবার খরচের জন্যেই আপনি টাকাটা চেয়েছিলেন। কিংবা আপনার একতলা বাড়িটা দোতলায় রূপান্তর করে ভাড়াটের কাছ থেকে দু'লাখ টাকা সেলামী পাওয়ার আশা

করেছিলেন। তখন ছেলের শ্বশুরকে কথার খেলাফ করার অপরাধে পুত্রবধূকে 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোমে' ভর্তি করিয়ে দিলেন চিকিৎসার ছুতো করে।

আর তারপর?

তারপর আপনি যা চাইছিলেন তা-ই হবে। অসুখ হলে সবাই-ই যে সুস্থ হয়ে উঠবে, এমন কোনও কথা নেই। মৃত্যু হলে ডাক্তার পরমার্থ বোস নিয়মিত ডেথ-সার্টিফিকেট দেবে। তখন আপনি নতুন করে আবার ছেলের বিয়ে দিন। আবার নতুন করে যৌতুক নিতে পারবেন। এমন পরোপকারী ডাক্তার কলকাতা শহরে আর কোথায় পাবেন আপনি?

না, এসব কথা বেশি জোরে বলা উচিত নয়। তাই কল্যাণী অংশুমানের কথায় রাজি হয়ে গেল।

অংশুমান জিজ্ঞেস করলে—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করছিলেন না, তাই তো পরমার্থকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলুম। এখন বিশ্বাস হলো তো?

কল্যাণী কী আর বলবে! তার সারা শরীরের রক্ত তখন তার মাথায় গিয়ে উঠেছে। এত টাকা কল্যাণীর হাতের মুঠোয় এসে ফসকে যাবে?

সেদিন অনিন্দ্য সেন বাড়িতে আসতেই কল্যাণী কাছে এসে দাঁড়ালো। অনিন্দ্য সেন সারাদিন খেটেখুটে এসেছে। এ সময়ে একটু শারীরিক আর মানসিক বিশ্রাম সব মানুষের পক্ষেই অপরিহার্য। একটু আরাম, একটু সহানুভূতি, একটু অনুরাগ, একটু বা আদরের প্রয়োজন অনিবার্য হয় সব মানুষেরই। কিন্তু অনিন্দ্য সেন কোনও দিনই তা পায়নি। যখন চাঁপা ছিল, যখন কালীদাসী ছিল, তখন তবু সামান্য হলেও কিছুটা পেয়েছে। কিন্তু তার পর থেকে কল্যাণীর মুখ থেকে গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডের মতো কেবল একটা কথাই বার-বার শুনে এসেছে—টাকা, টাকা, টাকা, টাকা, টাকা······

প্রথম প্রথম আড়াই শো টাকা মাসোহারা। তাই নিয়ে কয়েক মাস চললো!

তার পর সাদা-কালো টি. ভি. তারপর রঙিন টিভি। তারপর টেপ রেকর্ডার, তারপর রেকর্ড চেঞ্জার, তারপর টু-ইন-ওয়ান, থ্রী-ইন-ওয়ান, তারপর ভি-সি-আর ইত্যাদি ইত্যাদি একটার পর একটা—

এর যেন আর শেষ নেই। কোর্টে ছুটির দিন হলেই অনিন্দ্য সেনের মনের মধ্যে একটা অদৃশ্য আতঙ্কের সঙ্কেত উদয় হতো। এই বুঝি কল্যাণী আবার কী কেনবার বায়না ধরলে। এই বুঝি কল্যাণী আবার কী একটা চেয়ে বসলো। এই বুঝি আবার তার ন্যাগিং শুরু হলো!

এতদিন যা কখনও করে বসেনি তাই-ই সেদিন কল্যাণী করে বসলো।

কল্যাণীর হাসি-হাসি মুখ দেখেই অনিন্দ্যর একটু সন্দেহ হয়েছিল। এমন তো

হয় না। কল্যাণীর মুখে সচরাচর কখনও হাসি দেখেনি অনিন্দ্য। কেবল শুনেছে—টাকা, টাকা, আরো টাকা।

কিন্তু সেদিন অন্য রকম।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? আজ যে এত হাসি-মুখ?

কল্যাণী বললে—কেন? আমার মুখে কি কখনও তুমি হাসি দেখনি?

অনিন্দ্য বললে—না, মনে তো পড়ে না। কিন্তু সে থাক, কেন তোমার এত হাসি-মুখ, তাই শুনি? আমাকে এক্ষুনি বাইরের ঘরে গিয়ে কার্তিককে ডিক্টেশান দিতে হবে।

—সে তো তোমাকে রোজই দিতে হয়, সে তো কিছু নতুন নয়।

অনিন্দ্য বললে—না, তা নয়, আজকে একটা খুব জরুরী ডিকটেশান দিতে হবে। তোমার কথাটা কী, তাই বলো।

কল্যাণী বললে—কথাটা তোমাকে বলবো কি না, তাই ভাবছি।

—না, বলেই ফেলো।

কল্যাণী বললে—তোমার জুনিয়ার অংশুমানের কথা বলছি।

—অংশুমান? সে তো এখন আর আমার জুনিয়ার নেই। যখন ছিল তখন ছিল। তা, তার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো?

কল্যাণী বললে—সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

—তাই নাকি? কেন? সে আবার তোমার কাছে আসতে গেল কেন?

কল্যাণী বললে—তার নাকি খুব টাকার টানাটানি চলছে।

—তার টাকার টানাটানিতে তুমি কী করবে?

কল্যাণী বললে—সে একটা কথা বলেছিল যে তুমি যদি তাকে একটু ফেভার করো—

—আমি? আমি তাকে কী ফেভার করবো? কী ধরনের ফেভার?

কল্যাণী আরো মোলায়েম করে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করে বললে—শুনলাম ওর দাদা মারা যাওয়ার পর ঘাড়ে অনেক নাবালকের ভার পড়েছে। ওর একলার আয়তেই নাকি সকলের লেখাপড়া খাওয়া-পরা চলছে। এদিকে জিনিসপত্রের যা দাম তাতে নাকি সংসার চালাতেই খুব হিম-শিম খেয়ে যাচ্ছে।

অনিন্দ্য বললে—তা এতই যদি অভাব, তাহলে শখ করে আবার টি. ভি. কিনতে গেল কেন?

—কে বললে টি. ভি কিনেছে?

অনিন্দ্য বললে—অংশুমানই তো নিজের মুখে আমাকে সে-কথা বলেছিল। জুনিয়ার হিসেবে কেস্ পিছু ওর ফিজ তো ডবল্ করে দিয়েছিলুম। আমি তো তখন আমার ফীজ্ বাড়াইনি। একদিকে লাক্সারিও করা চাই আবার টাকার অভাবের

কথা সকলকে বলে বেড়ানোও চাই। এই জন্যেই তো আমি কলকাতার লোকেদের দু' চক্ষে দেখতে পারি না। জানো, এইজন্যেই আমি বরাবর বলি উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে যখন ইংরেজরা ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গেল তখন সমস্ত ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেল, কিন্তু একমাত্র বাঙালীরাই তখন আবার নতুন করে পরাধীন হলো। এত বাবুয়ানি কেন বলো তো বাঙালীদের? বাঙালীরা আগে ইংরেজদের অধীনে কাজ করতো, কিন্তু তখন থেকে কাজ করতে লাগলো মারোয়াড়ী আর গুজরাটীদের অধীনে। এর জন্যে ওই অংশুমানরাই তো দায়ী!

অনিন্দ্যকে রাগিয়ে দিলে কল্যাণীর কার্য-উদ্ধার হবে না। তাই অনিন্দ্যর কথায় কল্যাণী নিজের মেজাজ গরম করলে না। শুধু বললে—ও সব কথা থাক গে, এ তো তোমার কোর্ট নয়, এ তোমার বাড়ি! তোমার বাড়িতে এ লেকচার না দিয়ে কোর্টে গিয়ে এই লেকচার দিও, সেখানে ও লেকচার শুনে সবাই হাততালি দেবে!

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তা যাক গে, বেচারী বড় কষ্টে পড়েই আমাকে এই কথাগুলো বলতে বলেছে তোমাকে।

—তা আমি কী করে তাকে টাকা পাইয়ে দেব? যা তার ফীজ্ তা-ই সে পাবে। আমি এখন তো আর এ্যাড্ভোকেট নই, এখন আমি তো জাস্টিস্।

কল্যাণী বললে—অন্ততঃ তুমি এইটুকুও তো করতে পারো যে তোমার ডিভিশনে অংশুমান যে ব্রীফ নিয়ে যাবে তুমি ওকে জিতিয়ে দেব।

—সে কী করে হয়? আমি অন্যায় করে ওর ফেভারে জাজমেন্ট দেব?

কল্যাণী বললে—ওগো, এটুকু তোমায় করতেই হবে। ওর নাবালক ভাইপো-ভাইঝিদের মুখের দিকে চেয়ে তোমায় এটুকু করতেই হবে।

বলে কল্যাণী অনিন্দ্যর হাত দুটো ধরে ফেললে। বললে—এ তোমায় করতেই হবে—শুধু যে নাবালক ভাইপো-ভাইঝি, তাই-নয়। ওর দাদা হাজার পঞ্চাশেক টাকার দেনাও রেখে গেছে, সেই সব কথা ভেবেও তোমার এটুকু করা উচিত!

অনিন্দ্য কী বলবে বুঝতে পারলে না।

কল্যাণী বললে—বলো, তুমি এটুকু করবে? বলো, বলো, আমাকে কথা দাও—অনিন্দ্যর সঙ্গে কল্যাণী আগে কখনও এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলেনি।

—বলো, ওগো, আমাকে কথা দাও, বলো?

অনিন্দ্য বিব্রত হয়ে পড়লো। বললে—আচ্ছা, অংশুমানের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন বলো তো? তুমি অংশুমানের জন্যে এত পীড়াপীড়ি করছো কেন? তোমার এতে কী স্বার্থ?

কল্যাণী বললে—আমার আবার কী স্বার্থ? সে আমার কে? কেউ না। তার অনাথ ভাইপো-ভাইঝিদের কথা শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল জানো?

আর এতে তো তোমার কোনও স্বার্থত্যাগও করতে হবে না। ওকে না হয় তুমি আগের দিকে কোন্ পয়েণ্ট নিয়ে প্লীড্ করতে হবে, তা বলে দেবে।

এবারও অনিন্দ্য চুপ করে রইলো।

কল্যাণী সাহস পেয়ে বললে—ও তো আগে তোমার জুনিয়ার ছিল। তখন তো তুমিই ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে। এখনও তুমি ওর মামলাটার আগের রাতে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিও কী প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে—তা হলে কেউ আর কোনও সন্দেহ করতে পারবে না।

অনিন্দ্য এ কথার কোনও জবাব দিতে পারলে না।

বললে—ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

বলে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু কল্যাণী সামনে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়ালো। বললে—তোমাকে যেতে দেব না আমি, আগে আমার কথাটার জবাব দিয়ে যাও। বলো—ওকে জিতিয়ে দেবে?

অনিন্দ্য বললে—আমাকে একটু ভাবতে দাও আগে।

কল্যাণী বললে—এতে এত ভাববার কী আছে? তুমি রাজি হলে একটা সংসার বেঁচে যায়, আর তুমি কি চাও ওরা সবাই মরে যাক? এতগুলো লোকের জীবন বড়, না তোমার আইন বড়ো?

অনিন্দ্যর তখন দেরি হয়ে যাচ্ছিল। কল্যাণীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই বললে—ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই-ই হবে!

বলেই অনিন্দ্য তার নিজের চেম্বারের দিকে চলে গেল। সেখানে তখন কার্তিক নোট নেবার জন্য অপেক্ষা করছে।



কোর্ট-ঘরে তখন অনিন্দ্য সেন বলে চলেছেন—সেই এইটিন্থ্ সেঞ্চুরির ফ্রান্সে সায়ানটিস্ট ল্যাভোজিঁয়ার ল্যাবরেটরির দরজায় মাঝরাতে আবার টোকা পড়লো—

—কে?

ল্যাভোজিঁয়ার নিজের লেখা বইটা তখন বাজারে বেরিয়ে গেছে। বইটার নাম দিয়েছেন তিনি 'Method of Chemical Nomenclature'; লেখকের নাম এঁ্যান্তনি লরেঁ ল্যাভোজিঁয়া। সঙ্গে তিন জন সহকারী—নাম 'দ্য মোরভিউ', 'বার্থোলেট' আর 'ফোরক্রয়'। শুধু বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, সারা দুনিয়ায় তখন সেই বই নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে। আগে যার নাম ছিল 'ইনফ্লেমেবল্ এয়ার' তার নাম তিনি দিয়েছেন

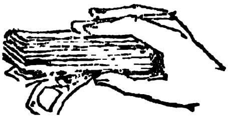
হাইড্রোজেন' আর তার আগে যার নাম ছিল 'ফিক্সড্ এয়ার' তার নাম তিনি দিয়েছেন কার্বন ডাই-অক্সাইড'। এই দুটো রসায়ন মিলে যা তৈরি হলো তার নাম হলো এইচ-টু-ও', মানে জল। জল যে ঝরনা থেকে পড়ে নদী হয়ে জনপদ অতিক্রম করে ঘূর্ণিল গতিতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তার মূল হচ্ছে ওই 'অক্সিজেন'। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন একটা পূর্ব নির্ধারিত মাত্রায় মিললেই তা থেকে একটা তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব হয়। সেই তৃতীয় বস্তুটার নামই হলো জল। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে জল থেকে মাটি সৃষ্টি হয়, এই ধারণাটা ভুল। জল থেকে যা তৈরি হয় তা হলো ভেপার' বা বাষ্প। এই যে আগুন জ্বলা—এও অক্সিজেনের ফলেই ঘটছে। এই যে লোহায় মরচে পড়া। এও অক্সিজেনের ফল। আগুন হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন হওয়া, মরচে পড়ার নিয়ম হচ্ছে ধীর-গতি অক্সিজেন। এই যে গন্ধক, ফসফরাস জিনিসগুলো জল আর অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়, এই গ্যাসই হচ্ছে অক্সিজেন।

আমি বৈজ্ঞানিক নই, আমি বিজ্ঞানের কিছুই বুঝি না। আমি সামান্য একজন আইনবিদ। আমার সবই বই পড়ে শেখা। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ বৈজ্ঞানিক থাকেন তো ল্যাভোজিঁয়ার লেখা সেই বই পড়ে দেখতে পারেন। বইয়ের নাম 'Elementary Treatise of Chemistry'। সেই বইটা বেরোল ১৭৮৯ সালে। আর সারা পৃথিবীতে ওই বইটি উপলক্ষ করে তোলপাড় পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফ্রান্স জুড়ে শুরু হয়ে গেল এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ। ফরাসী দেশের সমস্ত মানুষ সামিল হলো সেই বিদ্রোহে। মহারাজা মহারাণী সবাইকে কেটে ফেল। রাজা রাণী আর রাজবংশের সবাইকে কোতল করো। রাজা রাণীর প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দাও, রাজার জেলখানার সিং-দরজা ভেঙে ফেল। ভেঙে ফেলে সব বন্দীদের মুক্ত করে দাও। এই অত্যাচার, এই অপরাধ, এই পীড়ন আমরা আর সহ্য করবো না। আমরা চাই ইকোয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি, লিবার্টি। আমরা সবাই সমান। আমরা সবাই সবাইকার ভাই, আমরা সকলেই স্বাধীন। খুঁজে বার করো কে কোথায় মহারাণীর দেওয়া 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়েছে, 'পদ্মভূষণ' উপাধি পেয়েছে। কে পেয়েছে 'ভারতরত্ন' উপাধি। তারা সবাই অপরাধী। তারা সবাই অত্যাচারী। মহারাজা আর মহারাণীর অনুগ্রহপুষ্ট মানুষরাও একই অপরাধে অপরাধী। তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে এনে জনতার আদালতে আসামী করে দাও। তাদের সবাইকে একে একে কোতল করো—

ল্যাভোজিঁয়ার ল্যাবোরেটারির দরজায় আবার ঘন-ঘন টোকা পড়লো।

তিনি নিজের কাজে এত মগ্ন ছিলেন যে সে-শব্দ তাঁর কানে গেল না। তিনি তখনও আরো অনেক গবেষণা করে চলেছেন। হঠাৎ আবার টোকা। এবার আরো জোরে।

ল্যাভোজিঁয়া জিজ্ঞেস করলেন—কে?



কল্যাণীর বাড়িতেও সেদিন কলিং-বেলটা বেজে উঠলো।

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে—কে ?

তখন দুপুর। কার্তিকও নেই। অনিরুদ্ধ সেন প্রতি দিনের মত যথাসময়ে কোর্টে বেরিয়ে গেছে। একতলার ঘরে শাশুড়ী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। বয়েস হওয়ার পর থেকেই সুভদ্রা সাংসারিক কর্ম থেকে ছুটি নিয়েছেন। এখন বাড়ির কাজ-কর্ম টাকাকড়ির হিসেব সমস্তই থাকে কল্যাণীর হাতে। কাকে কী দিতে হবে, বাজার থেকে কী-কী আনাজ-পাতি আনতে হবে, সকলের খাওয়ার কী কী রান্না করতে হবে, তা সবই ঠিক করবে কল্যাণী। কল্যাণী বলতে গেলে এখন এ-বাড়ির আসল গিন্নী। সুভদ্রা এখন আর এ বাড়ির কেউ না। তিনি কল্যাণীর কাছে বাতিল। একটা ঝক্কি অবশ্য তখনও ছিল। সে চাঁপা। চাঁপা যদিও চরণ দাস বাবাজীর কাছে থাকতো, কিন্তু মাঝে মাঝে আসতো এ-বাড়িতে। চাঁপা এসেছে জানতে পারলে কল্যাণী রেগে যেত। বলতো—কী রে, তুই আবার এলি কেন? টাকা পাচ্ছিস না? মাসে মাসে তো তোর জন্যে ঠিক টাকা পাঠিয়ে দিই—চরণ দাস বাবাজী এসে নিয়ে যায়—

চাঁপা কল্যাণীকে দেখলেই ভয় পেত। বলতো—মার জন্যে বড় মন কেমন করে।

শাশুড়ী বলতো—তুমি অত রাগ করছো কেন বউমা? ও তো আমাকে দেখতে আসে। ওকে দেখতে তো আমারও ইচ্ছে হয়। কত ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। এ কি সহজে ভোলা যায় ?

যখন কল্যাণী কাছাকাছি থাকতো না, তখন সুভদ্রা চাঁপাকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে, বাড়িতে পেট ভরে খেতে পাস তো ? আজকে কী খেয়েছিস ?

চাঁপা বলতো—আজ ভাত আর আলুভাতে খেয়েছি।

—সে কী, তার সঙ্গে তরকারি খাসনি ? ডাল খাসনি ?

চাঁপা বলতো—বাবাজী বললে বাজারে ডালের দাম নাকি খুব বেড়ে গেছে সাতটাকা-আটটাকা করে নাকি কিলো।

সুভদ্রা বললে—আহা রে, আমি আর কী বলবো, তুই তো আগে মাছ না হলে ভাতই খেতে পারতিস না! এখন তোর মুখে ওই ভাত আর আলুভাতে রোচে ?

চাঁপা বলতো—কী করবো মা। পেটটা কোনও রকমে ভরাতে হবে তো।

সুভদ্রা বলতো—তোর কপালে যা আছে তা আর কে খণ্ডাবে বল? তুই তো দেখেছিস, এককালে এ সংসারের ভার তো তোর হাতেই ছিল। তখনও দেখেছিলি এখনও দেখে যা। এই তো এত বেলা হলো, এখনও পর্যন্ত চান করার গরম জল পেলাম না—এখন এ সংসারের এই হাল হয়েছে!

চাঁপা এ-কথার কীই বা জবাব দেবে। শুধু চাঁপা একলাই যে কষ্টে আছে তা নয়, সুভদ্রাও যে খুব কষ্টে আছে সেই কথাটাই মা'র কাছ থেকে নানাভাবে তাকে শুনতে হতো।

সুভদ্রা জিজ্ঞেস করতো—তুই যে এই সময়ে এলি, রান্না-বান্না কে করছে?

চাঁপা বলতো—বাবাজী তো ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। বাবাজী বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সেই যার নাম দুপুর দু'টো, তখন উনুনে ভাত চড়াবো।

—কী রান্না করবি আজ?

চাঁপা বলতো—বাবাজী বাজার থেকে যা আনবে তা-ই রাঁধবো।

সুভদ্রা বলতো—এই রকম না খেয়ে যে তোর শরীর ভেঙে যাবে! নিজের শরীরের দিকে একটু দেখবি তুই। নইলে তোরও আমার মত দশা হবে।

চাঁপা বলতো—সত্যি মা, আমার খুব অম্বল হয়, আজকাল অম্বল উঠে খুব গলা জ্বালা করে।

—তা একটু ডাক্তারকে দেখাস নে কেন?

—ডাক্তার?

সুভদ্রা বলতো—হ্যাঁ, ডাক্তার না দেখালে তো শেষকালে তোর পেটের ভেতর ঘা হয়ে যাবে রে! তোর কি পেটে খুব ব্যথা করে?

চাঁপা বলতো—হ্যাঁ, খুব ব্যথা করে। মাঝে মাঝে এমন ব্যথা করে যে কেঁদে ফেলি।

সুভদ্রা চাঁপার কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। বলতো—তা এতদিন আমাকে বলিস নি কেন?

বলে কল্যাণীকে ডাকতো—বউমা, ও বউমা, এদিকে এসো তো একবার।

কল্যাণী ডাক শুনে কাছে আসতেই সুভদ্রা সবিস্তারে চাঁপার রোগের কথা বলতো। তারপরে বলতো—ওকে দশটা টাকা দাও তো বউমা, শেষকালে ও কি মারা পড়বে? কিছু না খেয়ে খেয়ে ওই ব্যারাম হয়েছে ওর। ওকে কত টাকা দাও মাসে মাসে?

কল্যাণী বলতো—ওকে তো আমি মাসে মাসে ষাট টাকা করে দিই, তাতেও কুলোয় না? বলে ঘরের ভেতরে গিয়ে দশ টাকার একটা নোট এনে চাঁপার হাতে গুঁজে দিত। তারপর শাশুড়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে সদরের কাছে এসেই তাকে ধমকাতো। বলতো—আবার এসেছিস তুই? তোকে বলিনি আমাদের বাড়িতে তুই মোটে আসবি না? বলু আর কখনও আসবি না, বলু?

তখন চাঁপা ভয়ে থর-থর করে কাঁপতো।

বলতো—আর আসবো না আমি।

কল্যাণী বলতো—আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্ আর আসবি না? দে, পায়ে হাত দে।

চাঁপা তখন চোখের জলে ভাসতো। কল্যাণী এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই চাঁপা বউদিমণিকে দেখলেই আঁতকে উঠতো। মনে হতো বউদিমণি তাকে একবার হাতের মুঠোয় পেলেই গলা টিপে মেরে ফেলবে।

• কল্যাণী তখনও শাসাতো—দে পায়ে হাত দে—পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর্ এ-বাড়িতে আর কখনও আসবি না!

চাঁপা কল্যাণীর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতো—আমি এই পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও এ-বাড়িতে আসবো না, আমাকে ছেড়ে দাও বউদিমণি, ছেড়ে দাও—

এ-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তবু এ-কথাগুলো কল্যাণী ছাড়া আর কেউই জানতো না। স্বামী অনিন্দ্য সেন, শাশুড়ী সুভদ্রা, আর্দালী ভাগবত, তাদের কানেও এ-খবরের বিন্দু-বিসর্গও যেত না। কিন্তু অনিন্দ্য সেন প্রতি মাসেই চাঁপাকে টাকা পাঠাবার জন্যে কল্যাণীকে বলে দিত।

এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন দুপুর বেলা সদর দরজায় টোকা পড়লো।

—কে?

—আমি অংশুমান।

কল্যাণী দরজা খুলে দিতেই অংশুমান ঘরে ঢুকলো। বললে—কী হলো? মিস্টার সেন রাজি হয়েছেন?

কল্যাণী বললে—হ্যাঁ, অনেক কষ্টে ওঁকে রাজি করিয়েছি। কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।

খবরটা শুনে অংশুমান খুব খুশী হলো।

কল্যাণী আবার বললে—তোমার সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে কথা বললুম।

—কী মিথ্যে কথা বললেন?

কল্যাণী বললে—বললুম তোমার বড়ভাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনা তোমার ঘাড়ে পড়েছে। আর তার নাবালক ছেলে-মেয়ে আর বিধবা বউদি তোমার ঘাড়ের ওপরে চেপে বসেছে। বললাম—এ-অবস্থায় তুমি যদি অংশুমানকে না বাঁচাও তো আর কে বাঁচাবে?

অংশুমান বললে—ভেরি গুড্ বউদি, খুব ভালো বলেছেন। তা হলে আমি মিস্টার সেনকে আমার কথা বুঝিয়ে বলতে পারি তো?

কল্যাণী বললে—নিশ্চয়! তিনি নিজে আমায় কথা দিয়েছেন যে তাঁর কোর্টে যদি তুমি ব্রীফ নিয়ে যাও তো তিনি তোমার ফেভারেই জাজমেণ্ট দেবেন।

—ঠিক আছে, আমি আজ রাত্তিরেই তাঁর কাছে আসছি। আমার একটা কেস্ও আছে তাঁর এজলাসে।

কথাটা বলে অংশুমান নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কল্যাণী তাকে ডাকলে—আর একটা কথা···

অংশুমান আবার ঘরের ভেতরে এলো। বললে—কী?

কল্যাণী গলাটা নিচু করে বললে—আমাদের বাড়ির সেই ঝি-টা, চাঁপা! তাকে চেনো তো?

—হ্যাঁ খুব চিনি। তার আবার কি হলো?

কল্যাণী বললে—সে বড্ড ঝামেলা করছে। তাকে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তা তো জানো? চরণ দাস বাবাজীর কাছে সে থাকে। চরণ দাসকে সেই জন্যে মাসে মাসে ষাট টাকা করে দিইও। কিন্তু তাতেও নাকি তার কুলোয় না। সে রোজ রোজ এ-বাড়িতে এসে শাশুড়ীর কাছে টাকার জন্যে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে।

অংশুমান বললে—সে কী? ষাট টাকাতে কুলোয় না তার? একটা লোকের খাওয়া-পরাতে আর কত টাকা লাগে? আপনি আর টাকা দেবেন না ওকে।

কল্যাণী বললে—তা এখন শুনছি তার পেটে নাকি খুব ব্যথা হয় মাঝে মাঝে।

—ব্যথা? কীসের জন্যে ব্যথা হয়?

কল্যাণী বললে—আমার তো মনে হয় ওর পেটে আলসার হয়েছে। নইলে অত ব্যথা হবে কেন?

অংশুমান বললে—পেটে অত ব্যথা যদি হয়, তাহলে তো আমাদের নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিতে পারেন—ট্রিটমেণ্ট করালে ও ব্যথা একেবারে সেরে যাবে।

কল্যাণী বললে—নার্সিং হোমে ট্রিটমেণ্ট করালে তো অনেক টাকা খরচাও লাগবে।

অংশুমান বললে—খরচা আবার কী লাগবে? বড় বড় জজ-ব্যারিস্টার-অ্যাড্ভোকেটদের ট্রিটমেণ্টের ব্যাপারে পরমার্থ তো একটা পয়সাও নেয় না। আর এটা যখন আপনার পার্টি, তখন আপনার কাছ থেকে আবার টাকা নেবে কী? আমি সব ঠিক করে দেব, আপনি ও নিয়ে কিছু ভাববেন না—তারপর একটু থেমে গলাটা আরো নিচু করে কল্যাণীর মুখের কাছে মুখ এনে বললে—আর একটা কাজ করতে পারেন?

—কী?

অংশুমান গলাটা আরো নিচু করে বললে—চাঁপাকে আপনি সাবাড় করতে চান?

—সাবাড়? তার মানে?

—একেবারে চিরকালের জন্যে রেহাই ? তাও রেহাই পেতে পারেন।

—কী করে ?

অংশুমান বললে—তাহলে মাসে মাসে ওই ষাটটা করে টাকাও আর আপনাকে দিতে হবে না। ওই টাকা দেওয়া থেকে আপনি চিরকালের মত রেহাই পেয়ে যাবেন।

—কী করে রেহাই পাবো, সেইটেই বলুন না ? তাহলে তো আমি একেবারে বেঁচে যাই।

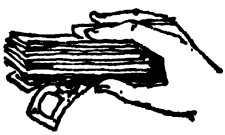
অংশুমান বললে—সে-ব্যবস্থা পরমার্থ তো হামেশা করছে তার নার্সিং হোমে। তাকে বললেই সে পাকা বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। পরমার্থ একেবারে ডেথ্-সার্টিফিকেট পর্যন্ত দিয়ে দেবে চরণ দাস বাবাজীর হাতে। কেউ কোনও সন্দেহ করবে না, পোস্ট মর্টেম পর্যন্ত করা হবে না। আপনি শুধু ওকে একবার নার্সিং হোমে পাঠাবার ব্যবস্থাটা করে ফেলুন, তারপরে যা করবার-তা আমিই করবো—সেটা আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন।

কল্যাণী বললে—ঠিক আছে, আপনি তো রাত্রে আমাদের বাড়িতে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আসছেন ?

—হ্যাঁ।

কল্যাণী বললে—তৎক্ষণ আমি একটু ভেবে নিই, পরে আপনাকে আমি সব জানাবো।

অংশুমান চলে গেল।



জীবন ছোট কিন্তু পৃথিবীটা অনেক বড়। অথচ এই পৃথিবী আগে জীবনের চেয়ে আরো আরো অনেক বড় ছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই পৃথিবীটা আগের চেয়ে আরো অনেক ছোট হয়ে আসছে। আগে তথাগত বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের তলায় বসে যা চিন্তা করতেন, সে-চিন্তা ইথারে ইণ্ডিয়া অতিক্রম করে কম্বোডিয়া, লাওস্, চায়নায় পৌঁছুতে প্রায় একশো বছর লাগতো। এক এক সময়ে দুশো তিনশো বছরও লাগতো। সোক্রেটিস যে-কথা ক'টা বলে মারা গিয়েছিলেন সে-কথা কত দেরিতে এসে ইণ্ডিয়াতে পৌঁছেছিল। এমন কি যীশুখৃস্টের বেলায়ও প্রায় তাই। কিন্তু পৃথিবী ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে আমেরিকা হেনরি ডেভিড থোরোর লেখা 'Civil Disobedience' বা 'অহিংস-সত্যাগ্রহ' বইটা বেরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

ইণ্ডিয়ার এম. কে. গান্ধী ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে 'অহিংস-সত্যাগ্রহ' আন্দোলন করে দেশকে স্বাধীন করলেন আর মহাত্মা গান্ধী হলেন। আবার সেই আমেরিকারই একজন কালো নিগ্রো অধিবাসী মার্টিন লুথার কিং মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে 'অহিংস-সত্যাগ্রহের' পদ্ধতি শিখে নিয়ে নিজের প্রাণ ত্যাগ করে আমেরিকার নিগ্রো অধিবাসীদের স্বাধীন করে দিয়ে মহাত্মা মার্টিন লুথার কিং হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতই অমর হলেন। আগেকার যুগ হলে কি এত তাড়াতাড়ি সেটা সম্ভব হতো ? এক দেশের কাছ থেকে যে-বাণী আর এক দেশে পাঠাতে আগে একশো দুশো বছর লাগতো তা আজ এক ঘণ্টায় পেঁছে যায়। আমেরিকায় টেনিস খেলা হলে তা দেখতে এখন আর মানুষকে আমেরিকা যেতে হয় না। এখন কলকাতার বস্তির ঘরের ভেতরে বসেই তা দেখা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী আজ ছোট হয়েছে বলেই হয়ত এখন মানুষও সঙ্গে সঙ্গে আরো ছোট হয়ে গেছে। কানাডাতে বসে বসেই এখন দিল্লীর মানুষকে খুন করা সম্ভব হয়েছে।

নার্সিং-হোম তো সৃষ্টি হয়েছিল মানুষকে নীরোগ করার জন্যে, মানুষকে রোগমুক্ত করার জন্যে। কিন্তু পরমার্থ বোস কেন নার্সিং হোমের ভেতরে বসে মানুষ খুন করবে ? তার কারণও কি এই যে পৃথিবী ছোট হওয়ায় মানুষও ছোট মাপের হয়ে গেছে ? তাহলে কি বিজ্ঞান এসে মানুষের কোন উপকারের বদলে কেবল অপকারই করেছে ? যে-বিজ্ঞান এ্যাটম্ বোমা তৈরি করে সে-বিজ্ঞানের প্রয়োজনটা কী ? যে-বিজ্ঞান শুধু ছোট পৃথিবীকে আরো ছোট করে দেয়, শুধু ছোট্ট মানুষকে আরো ছোট মাপের মানুষে পরিণত করে, সে-বিজ্ঞানের উপযোগিতাটা কী ?

মানুষ অনিন্দ্য সেন আবার বলতে লাগলেন—আমি আজ আপনাদের কাছে অকপটে স্বীকার করছি যে আমি একজন ছোটমাপের মানুষ হয়ে গিয়েছি। আপনারা কখনও কোথাও শুনেছেন যে কারো স্ত্রী বিয়ের পর স্বামীর কাছে আড়াই শো টাকা করে মাসোহারা চায় ? আপনারা কি কখনও কোথাও শুনেছেন যে এ্যাড্‌ভোকেটদের আর্থিক দুর্দশা দূর করবার জন্যে বিচারক তার ক্লায়েণ্টের পক্ষে জাজমেণ্ট দেয় ? আমি আপনাদের কাছে আজ অকপটে স্বীকার করছি যে এই ন্যায়ালয়ে বসে আমি সেই অন্যায়ই করেছি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি যে-অপরাধ করেছি তার জন্যে আমি আজ সব শাস্তিই মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। এ-অপরাধের কথা আমি যদি আগে জানতে পারতাম, তা হলে নিশ্চয়ই আমি এই চক্রান্তের বিরোধিতা করতাম। কিন্তু আইন বলে যে অজ্ঞতা কোনও অজুহাত হতে পারে না। তাই আমি শাস্তি চাই আপনাদের কাছ থেকে যে-শাস্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আপনারা, এই সমাজের মানুষরা বৈজ্ঞানিক ল্যাভোজিঁয়াকে দিয়েছিলেন, আজকে আমাকে সেই শাস্তিই দিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে আবার সেই মাঝ-রাতে টোকা পড়লো।

ল্যাভোজি'য়া জিজ্ঞেস করলেন—কে ?

তিনি ভাবলেন বোধহয় সেই অন্যবারের মত মহারাণীর লোক আবার তাঁকে বিষ আবিষ্কারের অনুরোধ করতে এসেছে।

দরজা খুলতেই দেখলেন অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—তোমরা আবার এসেছ ? আবার তোমরা এসেছ কেন ?

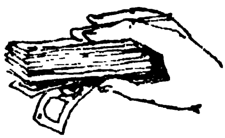
তারাও চিৎকার করে উঠলো—আমাদের সঙ্গে চলুন।

ল্যাভোজি'য়া বললেন—না, আমি যাবো না।

বলে জোর করে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। বাইরে থেকে তারাও দরজা ঠেলতে লাগলো। বাইরে থেকেই চিৎকার করতে লাগলো—দরজা খুলুন, নইলে ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলবো।

—না, আমি দরজা খুলবো না। আমি মহারাণীর আদেশ মানবো না, আমি বিষ আবিষ্কার করবো না। আমি মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো, আমাকে দিয়ে মানুষ হত্যা করা চলবে না।

বাইরে থেকে তারা সবাই মিলে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। আর ল্যাভোজি'য়াও ভেতর থেকে বলতে লাগলেন—না আমি বিষ আবিষ্কার করবো না। আমি মানুষ হত্যা করতে পারবো না—না, না, না—



সেইদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল ষড়যন্ত্রের খেলা। এ বড় ভীষণ খেলা। ভীষণ, কারণ এ খেলা যেমন গোপন, তেমনি প্রকট, যেমন অমোঘ, তেমনি অব্যর্থ। অংশুমান ব্রীফ্‌টা নিয়ে আসে অনিন্দ্য সেনের কাছে, আর অনিন্দ্য সেন সেটা পড়ে দেখে। আর বিধান দেয়। অংশুমানকে আরো টাকা পাইয়ে দিতে হবে। তার বড় ভাইএর পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনা শোধ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। তার নাবালক ভাইঝিদের মানুষ করে তোলার রসদ যোগাতে হবে।

এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার মধ্যেই অংশুমান পরের দিনের মামলার গোপন চাবি-কাঠিটা হাতে পেয়ে যায়। সেই চাবি-কাঠি হাতে নিয়েই সে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে যায়। এবার থেকে অনিন্দ্য সেন যতদিন চাকরিতে থাকবে ততদিন আর তার কোনও ভাবনা নেই। এবার থেকে সে হাতে সকলের মাথা কাটবে। সে রাজা মারবে, সে উজির মারবে।

এই রকম রোজ। রোজ এই রকমই চলে। তার আর ভাবনা কী? একটার পর একটা মামলা তার হাতে আসে আর অনিন্দ্য সেনের এজলাসেই তার শুনানী হয়। আর প্রত্যেকবার অংশুমান ঘোষের পক্ষেই রায় বেরোয়। তার পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনা শোধ করে দেয় অনিন্দ্য সেন, তার নাবালক ভাইপো-ভাইঝিদের মানুষ করে তোলে অনিন্দ্য সেন। অনিন্দ্য সেনই তার উদ্ধারকর্তা, অনিন্দ্য সেনই তার ইষ্ট-দেবতা। জয় হোক অনিন্দ্য সেনের, অনিন্দ্য সেনের জয় হোক।

মক্কেল মহলের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। কোর্ট-পাড়ায় তার জয়-জয়কার। তার চেম্বারে ক্লায়েণ্টদের কিউ পড়ে যায়। তার ফীজের গ্রাফ চড়-চড় করে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশ ছুঁতে চায়।

আর তার সঙ্গে সঙ্গে 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোমে'র সাইড পকেটে আরো হাজার-হাজার টাকা এসে ডিম পাড়ে। তারা যত ডিম পাড়ে তত তাদের বাচ্চা হয়। যত ডিম হয় তা থেকে দশগুণ বাচ্চা জন্মায় আর পরমার্থ বোস, অংশুমান আর কল্যাণীরা তাদের পোষ মানিয়ে আরো ডিম পাড়ায়। ক্রমে ক্রমে বাচ্চাগুলো যখন আরো বড় হয় তখন তারাও আবার ডিম পাড়ে। তখন সেই ডিম থেকে বেরোয় আমেরিকার ডলার, ইংল্যাণ্ডের পাউণ্ড, ফ্রান্সের ফ্র্যাঁ, ইটালীর লিরা, জাপানের ইয়েন। আর সেগুলো তখন সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের লকারে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। এমন ভাবে ঘুমোয় যাতে ইণ্ডিয়ার ইনকাম-টাক্সের পুলিসরা তাদের হাই তোলার শব্দ পর্যন্ত না শুনতে পায়।

এই সময়েই একদিন 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোমে'র দরজায় এসে দাঁড়ালো একজন মানুষ। এমন গরীব মানুষদের জন্যে তো সরকারী হাসপাতাল আছে। লোকটা সেখানে কেন যায় নি? কেন সেখানে না গিয়ে এই বড়লোকদের হাসপাতালে এলো?

দারোয়ান প্রথমে চরণ দাস বাবাজীকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলে—তুম ইঁহা আয়া কেঁও? তুম লোগোকে লিয়ে সরকারী হাসপাতাল হ্যায়, ইয়ে বড়ে আদমী লোগোঁকা নার্সিং হোম। তুম ভাগ্ যাও—

চরণ দাস বাবাজী প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে চাঁপা ছিল। সেও প্রথমে ভয়ে পেয়েছিল।

দরোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না, আর তারাও ঢুকবে। তাদের কাছে সুপারিশ আছে।

শেষকালে দরোয়ান জিজ্ঞেস করলে—কার সুপারিশ?

চরণ দাস বললে—হাকিম সাহেবের সুপারিশ।

তখন একটু যেন নরম হলো দরোয়ান। সেই সুপারিশের চিঠি ভেতরে গিয়ে খোদ ডাগ্দার সাহেবকে দেখাতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল নার্সিং-হোমে। তখন সেই

দরোয়ানেরই আবার অন্য রকম চেহারা। সেও তখন চরণ দাস বাবাজীকে সেলাম করতে লাগলো। বললে—সেলাম হুজুর, সেলাম!

শুধু সদর দরজাতেই নয়, ভেতরকার মেথর, সুইপার, নার্স সবাই-ই তটস্থ হয়ে উঠেছে। কেমন করে রোগীকে তারা সেবা করবে সেটাই যেন ভেবে পেলে না। বোধহয় পশ্চিম-বাংলার রাজ্যপাল এলেও এদের কাছ থেকে এত সেবা পাবে না। চরণ দাস বাবাজী আর চাঁপা দুজনেই এত খাতির পেয়ে হতবাক হয়ে গেল। এত বড় কেবিন, এত বড় ঘর, এত সুন্দর বিছানা, এত চমৎকার ডাক্তারদের ব্যবহার। তাদের মন-প্রাণ সব জুড়িয়ে গেল। বাইরে অমন গরম আর ভেতরে এমন ঠাণ্ডা। বাড়ির চেয়ে এই হাসপাতালেই তো লোকে থাকতে পারে! বাড়ির চেয়ে হাসপাতালেই তো বেশি আরাম। চাঁপার পেটের সব ব্যথা যেন সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল।

চরণ দাস ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—আমার মেয়ের চিকিৎসাতে কত টাকা লাগবে হুজুর?

ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—টাকা? একটা নয়া পয়সাও লাগবে না এখানে। গরীব লোকেদের কাছ থেকে আমরা টাকা নিই না।

চরণ দাস বাবাজী বার বার তার আরাধ্য দেবতা গৌর-নিতাই-এর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে লাগলো—জয় গৌর, জয় নিতাই—চাঁপাকে আমার ভালো করে দাও তুমি।

ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি চাঁপাকে আমাদের কাছে রেখে বাড়ি চলে যাও। কিছু ভেবো না।

চরণ দাস জিজ্ঞেস করলে—আমার চাঁপা-মা বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু? সংসারে আমার চাঁপা-মার কেউ নেই ডাক্তারবাবু। কেউ নেই আমার চাঁপা-মার, আমার চাঁপা-মার রোগ সারবে তো?

ডাক্তারবাবু চরণ দাসকে বার বার নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করলেও চরণ দাস বাবাজী যেন নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তার নিজের কোনও টাকা-পয়সা ছিল না, কোনও আত্মীয়-স্বজনও ছিল না, কেবল ছিল চাঁপা-মা। চাঁপা-মাই ছিল চরণ দাস বাবাজীর বাবা-মা-ভাই-বোন-মেয়ে-সন্তান সব কিছু। যেদিন হাকিম-সাহেবের বউ চাঁপা-মাকে তার হাতে তুলে দিয়েছিল, সেইদিন থেকেই যেন চরণ দাস নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছিল। সেদিন থেকেই যেন চরণ দাস নতুন করে নতুন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল। চরণ দাস ভিক্ষে করে বাড়িতে এসে যখন বিশ্রাম করতো তখন চাঁপা-মা এসে তাকে পাখা দিয়ে বাতাস করতো। চরণ দাস বার বার বারণ করলেও চাঁপা-মা কথা শুনতো না। তারপর রান্না করতে বসতো চাঁপা-মা। খেতে খেতে বেলা দুপুর দুটো তিনটে বেজে যেত।

একদিন চাঁপা-মা বললে—আজ আমি আর আমার ভাত রান্না করিনি বাবা।

চরণ দাস অবাক হয়ে যেত চাঁপা-মার কথা শুনে। বলতো—কেন?

চাঁপা-মা বললে—আমার খিধে নেই।

—কেন? খিধে নেই কেন

চাঁপা-মা বললে—পেটে কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা করছে—

পেটে ব্যথা-ব্যথা করা মানেই শরীর খারাপ হওয়া। শরীর খারাপ হওয়া মানেই ডাক্তারকে দেখানো। কিন্তু ডাক্তারকে দেখাতে গেলেই টাকার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু তার টাকা কোথায়? সরকারী দাতব্য ডাক্তারখানাতে গেলে অবশ্য হয়। সেখানেও অনেকবার গেছে চাঁপা-মা। সেখানে গেলে ঘন্টা দু'য়েক অপেক্ষা করার পর এক শিশি রং-করা জল মেলে। কিন্তু সে-ওষুধ যতবার সে খেয়েছে ততবার ব্যথাটা আরো বেড়েছে।

শেষকালে চাঁপা-মা একদিন তার পুরনো মনিব হাকিমসাহেবের বাড়িতে গেল। সেখানে হাকিম-সাহেবের বউদিমণিকে বলতে দশটা টাকা দিয়েছিল তার হাতে। তারপরে ভয় দেখিয়েছিল যাতে আর সেখানে না যায়।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। যখন তার পেটের ব্যথাটা আর এক দিন বাড়লো তখন আবার একদিন সে সে-বাড়িতে গিয়েছিল। তখন বউদিমণি একটা চিঠি দিয়েছিল চাঁপা-মার হাতে। বলে দিয়েছিল ওই চিঠিটা নিয়ে ওই ঠিকানাতে গেলে তারা চাঁপা-মাকে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দেবে। একটা পয়সাও লাগবে না ওষুধ-ডাক্তারের জন্যে। সব চিকিৎসাই তারা করে দেবে বিনা পয়সায়।

কিন্তু সেদিন কি চরণ দাস বাবাজী জানতো যে চাঁপা-মার সেই যাওয়াই একেবারে তার শেষ যাওয়া হবে?

রোজই বিকেল বেলা চরণ দাস বাবাজী নিজে হাসপাতালে গিয়ে চাঁপা-মাকে দেখে আসতো। ডাক্তারবাবু রোজ এক-কথাই বলতো—তোমার মেয়ে ভালো আছে।

চরণ দাস সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতো—কবে চাঁপা-মাকে ছেড়ে দেবেন ডাক্তারবাবু? কবে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো?

ডাক্তারবাবু বলতো—আর কিছুদিন পরেই সেরে উঠবে তোমার মেয়ে—তুমি আর বেশি ভেবো না।

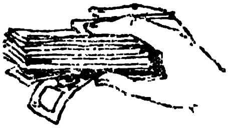
কিন্তু চাঁপা-মাকে দেখে চরণ দাস বাবাজী মনে মনে ভরসা পেত না। মনে হতো চাঁপা-মা যেন ক্রমে ক্রমে আরো রোগা, আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

চরণ দাস মুখ নিচু করে চাঁপা-মাকে জিজ্ঞেস করতো—আজ কেমন আছো মা তুমি?

চাঁপা-মা খুব নিচু গলায় কী বলতো বোঝা যেত না। আস্তে আস্তে মাথাটা একটু নাড়তো।

চরণ দাস আর কিছু কথা না বলে হাঁটতে হাঁটতে আবার বাড়ির মধ্যে এসে

ঢুকতো। কিন্তু তারপরে একদিন একটা কাণ্ড হলো। রোজকার মত সেদিনও চরণ দাস হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালে গিয়েছে। কিন্তু গিয়ে যা শুনলে তাতে তার অজ্ঞান হয়ে পড়বার মত অবস্থা হলো। ডাক্তারবাবু খবর দিলে—সব শেষ। চাঁপা-মা আর নেই!



অনিন্দ্য সেন আবার বলতে লাগলেন—আগে এক দেশ আর এক দেশকে অস্ত্র দিয়ে পরাস্ত করে সেই দেশের লোকেদের পদানত ক'রে রাখতো। এককালে ইংরেজরা সেই কায়দায় আমাদের পদানত করে রেখেছিল। এটাকে বলে মিলিটারি কন্‌কোয়েস্ট্‌। এখন এ্যাটম্‌বোমার যুগে সে-নিয়মটা উঠে গেছে। তার বদলে এখন পরের দেশকে পদানত করার অন্য পদ্ধতি বেরিয়েছে। এখন হ'য়েছে ইকোনমিক কন্‌কোয়েস্ট। পরের দেশে নিজেদের মাল বিক্রি করে তাদের গরীব বানিয়ে দাও। সস্তার মাল তাদের দেশে বেশি দরে বিক্রি করে বেশি মুনাফা লোটো। এর পরে আছে কাল্‌চারাল কন্‌কোয়েস্ট। ইণ্ডিয়ার লোকেরা বড় ধর্ম-ভীরু জাত। তারা এখনও ভগবান মানে। আমাদের খরচে আমাদের পয়সায় আমাদের দেশে নিয়ে এসে মদ খাইয়ে তাদের মাতাল করে দাও। তাদের জাতের কালচার ভুলিয়ে দাও। তাহলে তারা আর ভগবানের নাম করবে না।

এর পর আছে সায়াণ্টেফিক কনকোয়েস্ট, আমাদের দেশ থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্র এক্সপোর্ট করে তাদের দেশের লোকদের লোভ দেখাও। তারা বিলাসী হয়ে উঠুক। টি. ভি-র ওপর তাদের নেশা ধরিয়ে দাও। ভি. ডি. ও-র ওপর তাদের নেশা ধরিয়ে দাও। লাক্সারি গুড্‌স আর বিদেশী জিনিসের ওপর তাদের নেশা ধরিয়ে দাও। তখন গরীব ইণ্ডিয়ানরা আরো গরীব হয়ে যাবে। তখন ইণ্ডিয়ানরা আরো ভিখিরি হয়ে যাবে আর ইণ্ডিয়া যত গরীব হয়ে যাবে তত আমরা ইণ্ডিয়ার শহরে শহরে মহিলা খৃস্টান মিশনারীদের পাঠাবো। তারা ইণ্ডিয়ার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে সবাইকে খৃস্টান করে তুলবে। আমরা আগে অনেক খৃস্টান মিশনারীদের পাঠিয়ে দেখেছিলুম তারা বেশি লোককে খৃস্টান করতে পারেনি। কিন্তু এবার আমরা অন্য পলিসি ধরেছি। পাদরীদের পাঠিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও যে-কাজ হয়নি তার চেয়ে অনেক কম খরচে অনেক লোককে খৃস্টান করেছে এই মহিলা মিশনারীরা। দিন দিন ইণ্ডিয়ান বস্তি বাড়ছে। এই মহিলা খৃস্টান মিশনারীরা যত দিন ইণ্ডিয়ার

থাকবে তত দিন ইণ্ডিয়ার বস্তির সংখ্যা আরো বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টান হবে আরো বেশি লোক। আমরা তাঁদের আরো বেশি সম্মান দেব, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টও তাঁদের অনেক সম্মান দেবে। তখন এই মহিলা খৃস্টান মিশনারীদের আর কেউই সন্দেহ করতে পারবে না।

তাই সেদিন যখন আমি বাড়িতে চেম্বারে বসে আছি, হঠাৎ আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির চরণ দাস বাবাজী। তাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। সে চাঁপাকে নিয়ে একটা বস্তিতে থাকতো।

জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো তোমার? কাঁদছো কেন চরণ দাস?

চরণ দাস বললে—আমাকে বাঁচান বাবুসাহেব। আমার চাঁপা-মা আর নেই!

—নেই? নেই মানে?

চরণ দাস বললে—তার পেটে ব্যথা হয়েছিল, তাই বউদিদিমণি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছিলেন—আজকে সেখানে যেতেই তারা বললে আমার চাঁপা-মা মারা গেছে!

—কোন্ হাসপাতালে?

চরণ দাস বললে—কী, একটা হাসপাতাল তার নাম মনে নেই, এই কাগজটাতে সব লেখা আছে।

আমি কাগজটা পড়ে দেখলুম লেখা রয়েছে 'লাইফ-বিওর নার্সিং হোম'। তার নিচেই ঠিকানা লেখা রয়েছে। ডাক্তারের নাম, ডাক্তারের ডিগ্রী লেখা রয়েছে।

তখন আর দেরি না করে সোজা সেই পাড়ার থানাকে টেলিফোন করে দিলুম। বলে দিলাম আমি কে। আরও বলে দিলুম যে ডেড্ বডি যেন পুড়িয়ে ফেলা না হয়, যেন যথাস্থানে পোস্ট-মর্টেম করানো হয়! কারণ মনে হচ্ছে এ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, মনে হচ্ছে এ একটা মার্ডার কেস!

আর চরণ দাসকে আরো কী কী করতে হবে তাও বলে দিলাম। কার কাছে যেতে হবে তাও বলে দিলাম। তারপর কয়েকদিন পরে সে পুলিশের থানা থেকে পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট এনে আমাকে দেখালে। আমি দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। দেখি তাতে লেখা রয়েছে রোগিনীর ইণ্টেস্টাইনে, পেটের ভেতরে, সমস্ত শরীরে মরফিয়া বিষ পাওয়া গেছে, অথচ ডাক্তার পরমার্থ বোস ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে—ডেথ্ ফর এক্সেসিভ্ হেমারেজ। তার মানে অত্যধিক রক্তক্ষরণের জন্যে এই মৃত্যু হয়েছে।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। মনে হলো ইণ্ডিয়ার ওপর চারদিক থেকে শত্রুতা শুরু হয়েছে। শুধু আমেরিকা, শুধু কানাডা বা শুধু ইংল্যাণ্ড নয়। এমন কি শুধু রাশিয়াও নয়, আমাদের চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে এই বিষ। বহুকাল আগে আমার ছোটবেলাকার গুরু মোহম্মদ আশিফ আমাকে 'MAN' নামে একটা

বই উপহার দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। মনে হলো যেন তাঁর আশীর্বাদ আমার জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, আমি সে-বই থেকে কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারিনি। আমি মোহম্মদ আশিফ সাহেবকে অপমান করেছি। আমি তাঁর আশীর্বাদের যোগ্য এখনও হতে পারিনি।

তখনই আমি চরণ দাসকে শ'খানেক টাকা দিলাম।

দিয়ে বললাম তুমি নার্সিং হোমের ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করো।

মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার চরণ দাস বাবাজী কিছুই জানে না। আমি আমার এক উকিল বন্ধুর নাম-ঠিকানা দিলাম। সে মামলা চললো ছ' মাস ধরে। সেখানে চরণ দাস হেরে গেল। টাকার জোর এই যুগে সব চেয়ে বড় জোর। সে গরীব লোক। গরীব লোকরাই তো পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায়। বিশেষ করে ইণ্ডিয়ার গরীব লোক। তাদের কেউ নেই। তাদের টাকা যেমন নেই, তেমনি তাদের শিক্ষাও নেই। টাকা না থাকলে লোকবল যেমন থাকে না, তেমনি টাকা না থাকলে অন্য লোকের শুভেচ্ছা ভালোবাসা কিছুই থাকে না।

সেই মামলা এতদিন পরে এতকাল পরে আমার এজলাসে এসেছে। আর ভাগ্যের কী বিচিত্র কৌতুক যে আমি আজ এই মামলার বিচারক। কিন্তু না। আজকে এখন আমি এই মামলার বিচারক নই। এতদিন বিচারক অনিন্দ্য সেন মানুষের বিচার করে এসেছে, কিন্তু আজ মানুষ অনিন্দ্য সেন বিচারক অনিন্দ্য সেনের বিচার করবে।

সেদিন সেই ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের প্যারিসে তখন আরো অসংখ্য বিচারকের বিচার চলেছে। সেই বিচারকরা চিরকাল মানুষের বিরুদ্ধে অবিচার করে এসেছে। নিরপরাধ মানুষের ওপর অবিচার চলে এসেছে অকথ্য। এবার তারা বিচারকদের বিরুদ্ধে যৌথ-ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। এবার সেই সব বিচারকদের বিচারের ভার তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। তাদের সে বিচার বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম, বড় নির্বিকার।

এক-একজন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিকে সবাই মিলে ধরে আনে আর ওপর থেকে একটা ধারালো খাঁড়া এসে পড়ে ঠিক ঘাড়ের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে দূরে ছিটকে পড়ে।

আর তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে প্রজারা। ইকোয়ালিটি, লিবার্টি আর ফ্রেটারনিটির ধ্বজাধারীরা। তারা চায় সাম্য, তারা চায় স্বাধীনতা, তারা চায় ভ্রাতৃত্ব। আজ আর উঁচু-নিচুর ভেদ-বিভেদ নেই, আজ আর পরাধীনতার কোনও কলঙ্ক নেই, আজ সবাই আমরা ভাই ভাই।

যে নিজের চোখে সে-উৎসব দেখেনি সে তার বিভৎসতা কল্পনা করতেও পারবে না। এক একটা লোকের গলা গিলোটিনের খাঁড়াতে দু'ভাগ হয়ে যায় আর চারদিকে লোকেরা লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে ওঠে—একে চন্দ্র—

তারপরে আর একজনের মুণ্ডু কাটা পড়ে আর সবাই চিৎকার করে ওঠে—দুইয়ে পক্ষ—]

—তিনে নেত্র—

—চার-এ বেদ—

—পাঁচে পঞ্চবাণ—

—ছয়ে ঋতু—

—সাতে সমুদ্র—

—আটে অষ্টবসু—

—নয়ে নবগ্রহ—

—দশে দিক—

মানুষ এক এক করে মানুষের গলা কাটে, আর সবাই একসঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে। কতগুলো মানুষ খুন হলো তার হিসেব কষে। আনো, আরো বড়লোক আনো। এনে তাদের গলা কাটো। এতদিন যারা মানুষ খুন করে এসেছে, আজ তাদের ধরে এনে খুন করো।

সেদিন প্রকাশ্যে ফাঁসি-কাঠে যে কত লোককে এমনি করে ফাঁসি দেওয়া হলো তার পুঙখানুপুঙখ হিসেব লেখা আছে স্যার টমাস কার্লাইলের লেখা বই—'হিস্ট্রী অব্ ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন্'-এ। প্রতিশোধ-স্পৃহা যে কত অকরুণ হতে পারে, প্রতিশোধ স্পৃহা যে কত অকৃপণ হতে পারে, ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সে যেমন দেখা গিয়েছিল তেমন আর কোথাও, কোনও দেশের ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। এমন অনবরত আর এমন অপ্রতিহত সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিশোধ-স্পৃহার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে বে-নজির।

ল্যাভোজিঁয়ার ল্যাবোরেটারির দরজা তখন বাইরের লোকের ঠেলাঠেলিতে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বার অবস্থা। ভেতর থেকে ল্যাভোজিঁয়া চিৎকার করছেন। বলছেন—না, আমি বিষ তৈরি করবো না, তা সে মহারাণীর হুকুমই হোক আর মহারাজারই হুকুম হোক, আমি কিছুতেই বিষ তৈরি করবো না। আমি যে হাতে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে 'অক্সিজেন' আবিষ্কার করেছি সেই হাতে মানুষকে হত্যা করবার বিষ আমি আবিষ্কার করতে পারবো না!

তবু বাইরের লোকদের আক্রমণ অব্যাহত চলেছে।

কিন্তু বহুর সঙ্গে এক পারবে কেন?

শেষকালে ল্যাবোরেটারির দরজা বাইরের লোকের চাপে এক সময়ে আত্মসমর্পণ করলো, কাঠের তৈরি দরজা লৌহ-মানবদের দোর্দণ্ড প্রতাপে পরাজয় স্বীকার করলো।

—আমি বিষ তৈরি করবো না, আমি মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করবো, তাকে আমি অমৃত পুরুষ করবো। মহারাণীর হুকুম আমি মানতে পারবো না—

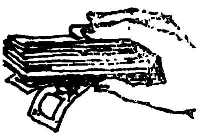
তারা সবাই মিলে তৎক্ষণে ল্যাভোজিঁয়াকে পাঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে তুলে ফেলেছে। তখনও ল্যাভোজিঁয়া বলে চলেছেন—আমি মহারাণীর হুকুম মানবো না, আমি মহারাণীর হুকুম মানবো না, আমি মানুষ মারার বিষ আবিষ্কার করবো না!

কিন্তু কে তখন তাঁর কথা শোনে?

তারা তখন বলছে—আপনার সব মিথ্যে কথা। আমরা জানি আপনি বিষ তৈরি করেছেন, মহারাণীর অনুরোধে আপনি আমাদের মারবার জন্যে বিষ তৈরি করেছেন—আমরা সব জানি, চলুন আমাদের সঙ্গে—

পৃথিবীর ইতিহাসে যতবার সোক্রেটিসরা জন্মাবে, যতদিন যীশুখৃস্টরা জন্মাবে, যতদিন মহাত্মা গান্ধীরা জন্মাবে, যতদিন মার্টিন লুথার কিংরা জন্মাবে, ততদিন মানুষের ইতিহাসের সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। সেই মসিঁয়ে এ্যাণ্টান লরেণ্ট ল্যাভোজিঁয়ারও সেই একই···

না, একথা এখন থাক। তার আগে মানুষ অনিন্দ্য সেনের কথা বলি ঃ



প্রতিদিন অনিন্দ্য সেন ঠিক যে সময়ে বাড়ি ফেরেন, সেদিনও সেই একই সময়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। চারপাশের সমস্ত বিষাক্ত আবহাওয়া দেখে তাঁর মনে হচ্ছিল ওই কলকাতার আবহাওয়াই শুধু নয়, সমস্ত কলকাতার মানুষগুলোও যেন তাদের নিঃশ্বাস থেকে বিষ উদ্গার করে দিচ্ছে। বিষে বিষে সমস্ত বাতাস যেন কলুষিত হয়ে উঠছে। সবাই যেন সব কিছু নিঃশেষ, সব কিছু বিনষ্ট না করে নিশ্চিন্ত হবে না। মোহম্মদ আশিফ সাহেবের উপহার দেওয়া সেই "MAN" বইতে একটা কবিতা লেখা ছিল। কবিতাটা এখনও মনে আছে অনিন্দ্য সেনের। কথাটা হচ্ছে—

Whenever God erects a house of prayer
The Devil always builds a chapel there
And it will be found upon examination
The latter has the largest congregation.

অর্থাৎ—যেখানেই ঈশ্বর প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির তৈরি করে দেন, শয়তানও ঠিক তার পাশেই তৈরি করে দেয় আর একটা মন্দির। খবর নিলে জানা যাবে যে সেই শয়তানের মন্দিরেই মানুষের ভিড়টা বরাবার বেশি হয়। নইলে বিয়ের পর কেন কল্যাণী তাকে বলেছিল—আড়াইশো টাকা করে তার মাসোহারা চাই। এ কথা কোনও নতুন বউ বিয়ের পর তার স্বামীকে বলে! এতদিনের বাড়ির কাজের লোককে কেউ এমন করে বাড়িছাড়া করে? অনিন্দ্য সেন যতবার চাঁপার জন্যে বেশি টাকা দিয়েছে সে-টাকা কখনও চাঁপার হাতে পেঁছোয়নি। কেন পেঁছোয় নি? চাঁপার সেই বাড়তি টাকা কোথায় গেল? কে সে-টাকা নিলে? অনিন্দ্য সেন চলন্ত গাড়িতে বসে বসেই ভাবতে লাগলেন এটা ভালোই হয়েছে যে তাঁর সন্তান হয়নি। তার নিঃসন্তান হওয়াটা তার কাছে আশীর্বাদই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পাপের রক্তের ওপর পূর্ণচ্ছেদ পড়লো, এ এক রকম ভালোই হলো।

হঠাৎ অনিন্দ্য সেনের খেয়াল হলো গাড়িটা যেন নড়ছে না, এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অনিন্দ্য সেন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, এখানে দাঁড়ালি কেন?

ড্রাইভারটা নতুন। তবু রাস্তাঘাট সব চেনে। বললে—'নো এনট্রি' করে দিয়েছে পুলিস।

অনিন্দ্য সেন বললে—তাহলে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে চল্, বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

তা তাই-ই করতে হলো। গাড়ি ঘুর-পথে ঘুরে চলতে লাগলো।

কোর্টে দাঁড়িয়ে অ্যাড্ভোকেটদের বলা কথাগুলো তখনও অনিন্দ্য সেনের মনের ভেতরে গুঞ্জন করছে। কেন চাঁপা মারা গেল? কেন পোস্টমর্টেম পরীক্ষায় তার শরীরে অত বিষ পাওয়া গেল? চাঁপাকে খুন করে ডাক্তার পরমার্থ বোসের কোন্ স্বার্থটা সিদ্ধি হলো? বিশেষ করে চাঁপাকে কেন ফ্রী বেড দেওয়া হলো? যে নার্সিং হোমে শুধু সমাজের ওপর তলার ধনী ও বিখ্যাত পুরুষ-নারীদের চিকিৎসা করা হয় সেখানে কার সাহায্যে এবং কার স্বার্থে চরণ দাস বাবাজীর মত গরীব লোকের পালিতা কন্যাকে ভর্তি করা হলো?

সরকারী ফরিয়াদী পক্ষের উকিল সুনীল সান্ন্যালের জেরার জবাবে ডাক্তার পরমার্থ বোস একেবারে জেরবার হয়ে গেল।

সুনীল সান্ন্যাল জিজ্ঞেস করলে—অ্যাড্ভোকেট অংশুমান ঘোষ কি আপনার নার্সিং হোমের একজন পার্টনার?

ডাক্তার বোসের মুখখানা এক মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে উঠলেও তিনি তখুনি সামলে নিলেন। বললেন—হ্যাঁ।

—মিসেস কল্যাণী সেনও কি একজন পার্টনার?

ডাক্তার বোস বললেন—না।

—তাহলে চাঁপাকে আপনার নার্সিং হোমে ফ্রী-বেড কেন দিলেন? কার অনুরোধে?

ডাক্তার বোস বললেন—এ রকম চ্যারিটি আমরা মাঝে মাঝে করি। সেটা আমাদের ডিসক্রীশন।

এ সব জেরা যখন চলছে তখন কোর্টে দিনের পর দিন মানুষের ভিড় বাড়ছে। এমন মুখরোচক খবরের স্বাদ সবাই-ই নিতে চায়। তাই কোর্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খবরের কাগজরাও কেসটা নিয়ে ব্যানার-হেডলাইন দিয়ে ছাপিয়ে তাদের বিক্রী বাড়ায়। কিন্তু অনিন্দ্য সেনও দিন দিন অশান্ত হয়ে ওঠেন।

বাড়িতে কল্যাণী জিজ্ঞেস করে—এ কেসটার কী হবে? কে জিতবে?

অনিন্দ্য সেন উত্তরটা এড়িয়ে যান। বলেন—এখনও তো হিয়ারিং চলছে, কোথায় শেষ হবে জানি না।

কল্যাণী আবার জিজ্ঞেস করে—আর ক'দিন হবে হিয়ারিং?

অনিন্দ্য সেন বলেন—দেখি, কী হয়। এখনও কিছু বলতে পারছি না।

একদিন সব কৌতুহলের শেষ হলো। বিচারক অনিন্দ্য সেন সমস্ত শুনানীর পর একটা তারিখ দিলেন। সেই তারিখেই তিনি রায় দেবেন জানালেন। সেদিন কলকাতার তাবৎ জনসাধারণ কোর্টে গিয়ে হাজির হয়েছে। সঙ্গে আছে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। ফরিয়াদী উকিল সুনীল সান্যাল, আসামী ডাক্তার পরমার্থ বোস, অংশুমান ঘোষও আছেন।

কিন্তু সেদিন সবাই অবাক হয়ে গেল অনিন্দ্য সেনের কাণ্ড-কারখানা দেখে। বিচারপতি অনিন্দ্য সেন সেদিন হঠাৎ মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিচারক অনিন্দ্য সেনের বিচার করতে আরম্ভ করলেন। একেবারে শুরু থেকে বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর জীবনের কথা। তার বাবার অফিসে চাকরি করতে অস্বীকার করা থেকে অ্যাডভোকেট হওয়া আর তারপর অ্যাডভোকেট থেকে বিচারপতি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা। তার পরে অনেক লিটিগেশন, অনেক আপীল, অনেক অরিজিন্যাল, অনেক ক্রিমিন্যাল মামলা মাড়িয়ে এই 'চাঁপা মার্ডার কেস'-এ এসে আজ তিনি তাঁর বাঞ্ছিত স্বর্গে এসে পেঁছেছেন। এখানে এসে পেঁছে তিনি এই চরম সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তিনি এখনও মানুষ হতে পারেন নি। তাঁর গুরু মোহম্মদ আশিফের সমস্ত আশীর্বাদ তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি পরের দিন এ মামলার রায় দেবেন—এই কথা বলে তিনি সেদিনের এজলাস বন্ধ করে দিয়ে চলে এসেছেন।

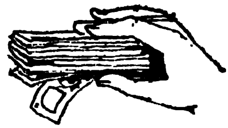
অনেক ঘুর-পথ ঘুরে গাড়িটা তখন বোধহয় কোনও অচেনা অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো সামনে কাদের একটা কালো অ্যামব্যাসাডার এসে দাঁড়াতেই সে-গাড়ি

থেকে যেন কারা নেমে তাঁর দিকে এলো। আর এক মুহূর্তের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

—কে? কে? কে?

অনিন্দ্য সেনের মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না। কারা যেন তাঁর মুখ চেপে ধরেছে। আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত জ্ঞান যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রাণপণে চিৎকার করতে গেলেন। কিন্তু কোনও শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। তিনি বুঝতেই পারলেন না কেন এমন হচ্ছে, কেন এমন করে তাঁকে সবাই মিলে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। তাঁর ড্রাইভার কোথায় গেল? এরা কারা? এ কলকাতার কোন অঞ্চল! তিনি জায়গাটা চেনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু চোখে তাঁর কী হলো? তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কেন?···

তারপর তাঁর আর জ্ঞান নেই···যেটুকু সামান্য জ্ঞান তখনও ছিল তাতেই তাঁর মনে হচ্ছিল যেন বিকট একটা ভারি যন্ত্রের শব্দ হচ্ছে কোথাও। যন্ত্রটা তাঁর কানের কাছে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো যেন তাঁর অস্তিত্বটি পর্যন্ত মুছে বিবর্ণ হয়ে গেল।



সেদিন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশেও সেই একই দুর্ঘটনা ঘটলো মশিয়ে ল্যাভোজিঁয়ার জীবনে। ঠিক বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই অনিন্দ্য সেনের জীবনের মত।

সবাই মিলে চারদিক থেকে তাঁকে জাপটে ধরে আছে। যেন তিনি পালাতে না পারেন।

তাঁর যুক্তি, তাঁর ওজর-আপত্তি, কিছুই শুনছে না কেউ। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে তারা ধরে নিয়ে চলেছে তা তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। চারদিকে এত ভিড়, চারিদিকে এত হল্লা কীসের? সব জায়গাতেই যেন 'নো এন্ট্রি' করে দিয়েছে কারা। কারোর মুখের চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গো, আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ তোমরা? কথা বলছো না যে?

তাঁকে যেন কেউ গ্রাহ্যই করলে না তারা।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—রাস্তায় রাস্তায় এত মানুষের ভিড় কেন গো! তবু কেউ মশিয়ে ল্যাভোজিঁয়ার কথার উত্তর দিলে না।

তিনি আবার বলতে লাগলেন—আমি তো বলেছি আমি বিষ তৈরি করতে পারবো

না। মহারাণীকে তোমরা গিয়ে বলতে পারো না যে আমি 'অক্সিজেন' তৈরি করেছি মানুষকে বাঁচাবার জন্যে। যে হাতে আমি মানুষকে বাঁচাবার জন্যে অক্সিজেন তৈরি করেছি সেই হাতে আমি মানুষকে মারবার বিষ তৈরি করবো কেমন করে? বিষ তৈরি করলে আমার যে পাপ হবে, আমি যে নরকে যাবো···হ্যাঁ গো, শুনছো তোমরা?

কিন্তু তখন কে আর কার কথা শোনে? চারদিকে মানুষ আর অমানুষের ভিড়। হৈ-চৈ, আর সামনে রক্তের স্রোত। কত রক্ত পান করলে যে মানুষের তৃষ্ণা মিটবে তার কোনও হিসেব থাকছে না। কেউ তার হিসেব করছে না। এক-একজনের হাতে এক একটা তালিকা। তাতে কত লোকের নাম রয়েছে। তাদের সকলকে ধরে আনা হয়েছে, আরো অন্য অনেককে ধরে আনার হুকুম জারি হয়েছে। পৃথিবীতে যত পাপী লোক আছে তাদের ধরে আনো। আর পাপী হোক আর না হোক আমাদের তালিকায় যাদের নাম আছে তারা সবাই পাপী। তাদের সকলকে ধরে আনো তোমরা। যারা 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়েছে, যারা 'পদ্মভূষণ' উপাধি পেয়েছে, যারা 'রায় সাহেব' 'রায় বাহাদুর' উপাধি পেয়েছে তাদের নামও আমরা আমাদের তালিকায় উঠিয়েছি। ধরে আনো সেই সব বিজনেসম্যানদের যারা মানুষদের ভালো করবার জন্যে খাঁটি সরষের তেল বেচেছে, যারা খাঁটি ঘি বিক্রী করেছে, খাঁটি দুধ বিক্রি করেছে, খাঁটি ওষুধ বিক্রি করেছে। ধরে আনো সেই সব যীশু খৃষ্টদের, সেই সব সোক্রেটিসদের আর সেই সব মহাত্মা গান্ধীদের। আমরা তাদের গিলোটিনের তলায় ফেলে তাদের দেহ থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেব।

—উনষাট—

—ষাট—

—একষট্টি—

—বাষট্টি—

—তেষট্টি—

—এ কে? এর নাম কী? এর নাম আমাদের লিস্টে আছে?

—হ্যাঁ স্যার, এর নাম অনিন্দ্য সেন।

—এ কী করেছিল? এর কী অপরাধ?

—এ কোর্টের বিচারপতি হয়ে সত্যি কথা বলেছিল।

—সে কী? সত্যি কথা বলেছিল? একে তো সকলের আগে শূলে চড়িয়ে খুন করা উচিত। একে এত দিন শাস্তি দেওয়া হয়নি কেন? যারা খাঁটি ঘি বেচেছে, যারা খাঁটি দুধ বেচেছে, যারা খাঁটি ওষুধ বেচেছে, যারা সত্যি কথা বলেছে, যারা ইনকামট্যাক্স নিয়মিত দিয়ে এসেছে, তাদের সকলের নাম তো আমাদের লিস্টে আছে। কী আশ্চর্য, এ কোর্টের বিচারপতি হয়ে সত্যি কথা বলেছে? এ তো ক্রিমিন্যাল নাম্বার ওয়ান।

—এ আরো কী পাপ করেছে জানেন স্যার? এর স্ত্রী বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর কাছে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা করে মাসোহারা চেয়েছিল। এ দেয়নি।

—কেন?

—এই অনিন্দ্য সেন বলেছিল যে অর্থের চেয়ে পরমার্থ বড়। এ আরো বলেছিল যে অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল। সেই মান্ধাতার আমলের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে এখনও এই অনিন্দ্য সেন নিজের স্ত্রীকেও মাসে মাসে মাসোহারার আড়াইশো টাকা দেয়নি। সেই টাকা না দেবার জন্যে এর স্ত্রী এদের বাড়ির ঝি-এর মেয়েটাকে 'লাইফ-কিওর নার্সিং হোমে' পাঠিয়েছিল তাকে খুন করে ফেলবার জন্যে।

—তারপর?

—তারপর সেই 'নার্সিং হোমে'র ডাক্তার তাকে বিষ দিয়ে খুন করেছিল। সেই নার্সিং হোমের ডাক্তারের পার্টনার ছিল অ্যাডভোকেট অংশুমান ঘোষ আর আসামী অনিন্দ্য সেনের স্ত্রী কল্যাণী সেন। নার্সিং হোমের যত প্রফিট হতো তার ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি শেয়ার পেত এরা দু'জনে।

—ভালোই তো! তাতে অন্যায়টা কী হয়েছে! নার্সিং-হোম জিনিসটার সৃষ্টিই তো হয়েছে মানুষকে মার্ডার করবার জন্যে! একেও গিলোটিন করো!

—স্যার আরো অনেক পাপ করেছে এই অনিন্দ্য সেন। এ ভগবান বিশ্বাস করতো। এ কালো টাকাকে পাপের টাকা বলে বিশ্বাস করতো!

—সে কী? এ যুগে এমন আহাম্মকও কেউ আছে? কালো টাকা তো কেউ বাড়িতে লুকিয়ে রাখে না, সবাই তো কালো টাকা ব্যবসাতেই খাটায়। তাতে তো গভর্মেণ্টের লাভই হয়, দেশের ইণ্ডাসট্রিতে প্রোডাকশান আরো বাড়ে। যে-লোক কালো টাকাকে নিন্দে করে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। একে গিলোটিন করো!

সঙ্গে সঙ্গে আসামীর গলা থেকে আওয়াজ বেরোল—না না, আমাকে মেরো না, আমি মানুষকে বাঁচাবার জন্যে 'অক্সিজেন' আবিষ্কার করেছি। আমি বিষ তৈরি করিনি। আপনারা মহারাণীকে জিজ্ঞেস করুন, যে হাতে আমি 'অক্সিজেন' তৈরি করেছি সে-হাতে আমি বিষ তৈরি করবো কী করে? আপনারা একবার মহারাণীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না!

সবাই আকাশ ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো।

—আরে, মহারাণী বেঁচে থাকলে তবে তো আমরা মহারাণীকে তা জিজ্ঞেস করবো। মহারাণীকেও যে আমরা গিলোটিন করে ফেলেছি। সেই মহারাণীই তো আমাদের এনিমি নাম্বার ওয়ান।

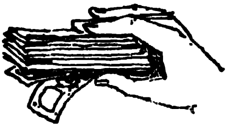
—সে কী? মহারাণী মেরী আঁতোয়েত নেই?

—না।

—তাহলে লুই দ্য সিক্সটিনথ? আমাদের সেই মহারাজা?

—তিনি তো আমাদের এনিমি নাম্বার টু। তাকেও আমরা গিলোটিন করে ফেলেছি। কোনও শত্রুকে মেরে ফেলতে আমাদের আর বাকি নেই।

অনিন্দ্য সেনের মুখ দিয়ে আর কোনও শব্দ উচ্চারিত হলো না। নির্বোধের মত শুধু বিমূঢ়ের মত হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তারপর···



তারপর বজবজের দিক থেকে একটা ট্রেন সোজা বধ্যভূমি লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটে আসছিল। অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যে নেমে এসেছিল। তারপরে ধীরে ধীরে চারদিকের জল-জঙ্গল আরো গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। কোথাও এতটুকু প্রত্যাশার আলোর ইঙ্গিত নেই। নেই এতটুকু ভরসার ইশারা। সব জায়গায় নৈরাজ্য। সবাই টাকার চরশ আর ঐশ্বর্যের গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে নেশাগ্রস্ত। আমরা সব কিছু ভুলে থাকবো। এই মাটির পৃথিবীর যন্ত্রণা এড়িয়ে আমরা নেশার স্বর্গে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে পরিত্রাণ পাবো। আমাদের তোমরা বিরক্ত কোর না। আমরা কী পাইনি, আর কী পেয়েছি, তার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে চাই! টাকার বদহজমে আমাদের চোঁয়াঢেকুর উঠেছে বলেই আমরা তোমাদের সকলের দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ ভুলে থাকবার জন্যে এই পথ নিয়েছি। আমাদের আর বিরক্ত কোর না কেউ। আমরা এখন সুখের সপ্তম স্বর্গে পেঁছে অমর হয়ে গিয়েছি···

দূর থেকে তখনও আসন্ন ট্রেনের চাকার চলাচলের শব্দ কানে আসছে। আর একটু পরেই ট্রেনটা সামনের একজোড়া রেল লাইন মাড়িয়ে তার গন্তব্যস্থলে চলে যাবে। আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। তার আগেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে—

—চৌষট্টি—

কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ভিড়টা উল্লাসে ফেটে পড়লো।

—পঁয়ষট্টি—

আবার উল্লাস, আবার আনন্দ।

—ছেষট্টি—

অন্ধকার রেল-লাইনের আশে-পাশের ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে দু'টো মূর্তি নিঃশব্দে কী যেন একটা ভারি জিনিসকে বাইরে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর ভাল করে চারদিকটা একবার দেখে নিলে। কেউ কোথাও নেই। এই-ই সুযোগ।

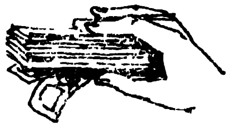
তারপর সেই ভারি জিনিসটা রেল লাইনের ওপর শুইয়ে রেখেই তারা কোথায় গিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর তারপর পশ্চিম দিক থেকে আসন্ন ট্রেনটার লম্বা হেড লাইট আরো জোরে সেই ভারি জিনিসটার ওপর এসে দৃষ্টিপাত করলে। কে? কে ওখানে রেল লাইনের ওপর শুয়ে আছো? কে? কে তুমি?

ড্রাইভার হুইশলটা আরো জোরে বাজাতে লাগলো। ওঠো, উঠে পড়ো। কে? কে ওখানে? উঠে পড়ো শিগ্‌গির। কিন্তু তার আগেই গিলোটিনটা সজোরে নেমে এসে পড়লো ভারি জিনিসটার গলার ওপর।

আর সঙ্গে সঙ্গে আবার জনতার আনন্দোচ্ছ্বাস, আবার জনতার উল্লাস!

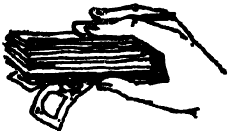
তারপর আবার নম্বর ডাকা শুরু হলো—সাতষট্টি…



পরদিন ভোরবেলা সংবাদপত্রের সামনের পাতায় একটা হেড লাইন দেখে সমস্ত কলকাতার লোক চমকে উঠেছে:

॥ বিচারপতি অনিন্দ্য সেনের অপঘাত মৃত্যু ॥

গতকাল সন্ধ্যার পর বজবজ-শেয়ালদহ রেল-লাইনের ওপর বিচারপতি অনিন্দ্য সেন-এর দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ একটি আপ লোক্যাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন মাঝেরহাট-কালীঘাট স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থলে তাঁকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাঁর ওপর দিয়ে চলার ফলে তাঁর স্কন্ধদেশ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ড্রাইভারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সমস্ত দুর্ঘটনাটি রহস্যপূর্ণ এবং পুলিসের তদন্তাধীন। এ সম্বন্ধে আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের প্রশ্নে পুলিস কমিশনার বলেন—দুর্ঘটনা এখন তদন্তাধীন। এটা হত্যা না আত্মহত্যা তা তদন্তের পর জানা যাবে। গতকালও প্রয়াত বিচারপতি যথারীতি আদালতের কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। বিকেলবেলা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে তিনি কোন্ সূত্রে কীভাবে যে উক্ত স্থানে গিয়ে পড়েছিলেন তা জানা যায় নি। তাঁর গাড়ির ড্রাইভারও নাকি আক্রান্ত হয়েছিল। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় নিকটস্থ সরকারী এস-এস-কে-এম হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে মুমূর্ষু অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে এখনও সংগ্রাম করে চলেছে। পরলোকগত বিচারপতি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন তাঁর স্ত্রী এবং বৃদ্ধা বিধবা মাতা।



আর ওদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্বে ফ্রান্সে তখন আর একজন আসামীর রক্তাক্ত মুণ্ডুটা বধ্যভূমিতে পড়ে আছে, আর অসংখ্য ব্যক্তির রক্তে তখন বধ্যভূমিটা ভেসে যাচ্ছে। এর নম্বর সাতষট্টি। 'অক্সিজেন' আবিষ্কারক এ্যান্তনি লরেন্ত ল্যাভোজিঁয়া। তার পরিণতি দেখে বধ্যভূমির সমস্ত মানুষ তখন উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ভিড়ের মধ্যে মাত্র একজন শুধু স্থির দৃষ্টিতে দেখছে সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যটা—তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত গণিতবিদ্—লা গ্রাঞ্জ।

তিনি ল্যাভোজিঁয়ার প্রাণহীন মুণ্ডুটা দেখে মন্তব্য করলেন—এই মুহূর্তে যে মুণ্ডুটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেইরকম আর একটি মুণ্ডু তৈরি করতে হয়তো বিধাতা-পুরুষের আরো কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে···